উনিশ শতক

বাঙালি মেয়ের যৌনতা

অর্ণব সাহা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই বইয়ের তিনটি প্রবন্ধেরই পটভূমি উনিশ শতকের বাঙালির সামাজিক ইতিহাস। সেই সময়, যখন ঔপনিবেশিক প্রভাবে বদলে যাচ্ছে বাঙালির মনন, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ। তিনটি লেখারই মূল বিষয় বাঙালির 'শরীর' এবং 'যৌনতা' সম্পর্কিত ডিসকোর্স। উনিশ শতকের মেয়েদের যৌনতা, যা আসলে চাঁদের উলটোপিঠ, প্রথম প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। দ্বিতীয় প্রবন্ধের বিষয় মেয়েদের পোশাক-সংক্রান্ত পাবলিক ডিসকোর্স, কীভাবে মেয়েদের পোশাক-সজ্জার ভেতর দিয়েই সেই মধ্য উনিশ শতক থেকে বাঙালি এলিট চেতনায় শরীর এবং যৌনতা সংক্রান্ত মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তৃতীয় প্রবন্ধে রয়েছে ক্ষমতার সঙ্গে যৌনতার সম্পর্ক ও দেশজ যৌনতার বোধকে ঔপনিবেশিক ডিসকোর্সে বেঁধে ফেলার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা। এই বই বাঙালির শরীর-যৌনতা সংক্রান্ত পরিবর্তমান ভাবনার একটি বিশ্বস্ত দলিল।

PRATIVASH

prativash1986@rediffmail.com

www.facebook/prativash.kolkata

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উনিশ শতক বাঙালি মেয়ের যৌনতা

প্রবন্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্ণব সাহা

উনিশ শতক বাঙালি মেয়ের যৌনতা

প্রতিভাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৭ বইমেলা

প্রতিভাস-এর পক্ষে বীজেশ সাহা কর্তৃক ১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড
কলকাতা- ৭০০০০২ (দূরভাষ : ২৫৫৭-৮৬৫৯) থেকে প্রকাশিত এবং
বইপাড়া পাবলিকেশনস্ (প্রিন্টিং বিভাগ), ১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড
কলকাতা-৭০০০০২ (দূরভাষ : ৬৫৪৪-৪৮৯৮) থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ সুদীপ্ত দত্ত

© অর্ণব সাহা

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনো রূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক্স ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনো মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনো পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনো ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনো তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN : 978-93-85393-48-8

UNISH SHATAK: BANGALI MEYER JOUNOTA
A collection of Bengali Essays
by Arnab Saha
Published by Prativash
18A, Gobinda Mondal Road, Kolkata 700002
e-mail: prativash1986@rediffmail.com / visit Prativash Kolkata

দাম ২৫০ টাকা Rs.250 $ 15

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

অধ্যাপক

মানস রায়-কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুরুর কথা

ডক্টরাল থিসিসের কাজ শুরু করেছিলাম ২০০৩-এর শেষ দিকে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে, অধ্যাপক সৌমিত্র বসুর তত্ত্বাবধানে। বিষয়টা সেই সময়ের পক্ষে একটু অফবিট হলেও সৌমিত্রদা বাধা দেননি। উনিশ শতকের বাংলায় যৌনতার রাজনীতি সেই সময় বাংলা ডিসিপ্লিনের পক্ষে কিঞ্চিৎ অন্য ঘরানার ছিল। আমার ব্যক্তিজীবনের নানা অভিজ্ঞতা এর পিছনে ক্রিয়াশীল হলেও একটা স্থির ভাবনা মূখ্যত কাজ করেছিল, যেটা আমার কাছে আজও খুবই প্রাসঙ্গিক মনে হয়, সেটা হল, বাঙালির মতো অবদমনপ্রবণ সমাজের যে চেহারাটা আমরা এই একুশ শতকেও দেখছি, তার কি কোনো সুনির্দিষ্ট পূর্ব-ইতিহাস আছে? এর কি কোনো জিনিওলজি খুঁজে বের করা সম্ভব? মধ্যযুগের বা তারও আগের সাহিত্যে যে শরীরী বর্ণনার উল্লেখ পাই, তা যদি সেদিনের সমাজের আংশিক ছবিও তুলে ধরে, যদি ধরে নেওয়া যায়, চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে আরাকান রাজসভার সাহিত্য বা অন্নদামঙ্গলের শরীরী বিবরণের ভিতর কিছুমাত্র বাস্তবতার ছোঁয়াচ রয়েছে, তবে বলতেই হবে, শরীর-বিষয়ক, যৌনতা-বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গির যে ডাবল-স্ট্যান্ডার্ড আজ আমাদের দৈনন্দিন ভাবনার অংশে পরিণত হয়েছে, তার নির্মাণেরও একটা সুনির্দিষ্ট ইতিহাস রয়েছে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, আমার ছাত্রজীবনে এই বিষয়টিকে সামগ্রিকভাবে ধরার জন্য যে তাত্ত্বিক পরিকাঠামো দরকার বাংলা আকাডেমিকস-এ তার রীতিমতো অভাব ছিল। প্রথমত, শরীর বা যৌনতা জিনিসটাই ছিল নিতান্ত উচ্চারণের অযোগ্য একটা ব্যাপার, তার আবার ইতিহাস আলাদাভাবে খুঁজে বের করার জন্যও যে পৃথক তাত্ত্বিক প্রস্থান রয়েছে, এবং বিগত ষাটের দশকের উত্তর-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রন্থনবাদী ভাবুকদের লেখায় যে তার একটা বিশাল আর্কাইভও গড়ে উঠেছে, বাংলার অন্যতম সেরা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হয়েও আমি আমার শিক্ষকদের মুখে কখনও তা উচ্চারিত হতে শুনিনি। দ্বিতীয়ত, যৌনতা মানেই যে কেবল শরীরী মিলনের বর্ণনা নয়, বস্তুত, দেহমিলনের অংশটুকু যে যৌনতা-সম্পর্কিত ধারণা ও আলোচনা, বিশ্লেষণের একটা ক্ষুদ্র অংশমাত্র, সেই চিন্তা, আমি আমার শোনা ক্লাস-লেকচারে প্রায় কখনোই পাইনি। কেউ কেউ অবশ্যই সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র, 'রতি' শব্দটির তাৎপর্য ইত্যাদি বিষয়ে দীর্ঘ আলোকপাত করেছেন, কিন্তু, আমাদের 'আধুনিক' হয়ে ওঠার ইতিহাসের সঙ্গে যৌনতার যে একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে, আর শুধুমাত্র অলংকারশাস্ত্রের চৌহদ্দিতে আটকে থেকে সেই জটিল, বহুমাত্রিক ইতিহাসকে যে বোঝা সম্ভব নয়, তার জন্য যে আমাদের নিজস্ব 'আধুনিকতা'-র ইতিহাসের ভিতর যৌনতার ইতিহাসকেও ঠাঁই দেওয়া দরকার, সেই চিন্তাসূত্রগুলি আমাদের ক্লাসরুমের বদ্ধ ঘরে খুব একটা ঢোকার সুযোগ পেত না। যদিও বিগত কয়েক বছরে বাংলা ডিসিপ্লিনের চেহারা অনেকটাই বদলেছে, একঝাঁক নতুন ছেলে-মেয়ে দুরন্ত কাজ করছে এখন। যেসব বই তখন জোগাড় করা বেশ কঠিন মনে হত, আজকের সদ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকা ছাত্রছাত্রীদের কাছে তা করতলগত আমলকির মতোই সহজ।

ফলত, সেদিন সমস্যা ছিল দু'ধরনের। প্রথমত, আমার নিজের ডিসিপ্লিনে, বাঙালির জীবনের যৌনতার ইতিহাসের ভগ্নাংশ খুঁজে বের করার মতো কোনো তাত্ত্বিক মডেল সামনে নেই। সেরকম কোনো রিসোর্স-পার্সনও নেই, যিনি, একটা কাজ চালাবার মতো কাঠামো ধরিয়ে দেবেন অথবা অন্তত সাহায্য করবেন। দ্বিতীয়ত, আমাদের শিষ্ট সাহিত্যে, 'হাই লিটারেচারে' এই বিষয়ের উচ্চারণ যে খুবই সামান্য, তা টের পেলেও এর আর্কাইভ যে কীভাবে, কোথায় গেলে খুঁজে পাওয়া যাবে, সে বিষয়ে কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। কারণ, বঙ্কিমের দাম্পত্যভাবনায় 'পবিত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাম্পতিপ্রীতি' ও 'রূপজ মোহে'র পৃথক স্থান, নৈতিকতার নিজস্ব চেহারা, রবীন্দ্রনাথের লেখায় বিদেহী প্রেমের অপরূপ বর্ণালির বিচিত্র ভঙ্গিমা নিয়ে দিস্তে দিস্তে আলোচনা আমরা শুনেছি, আর পেয়েছি সাহিত্য আলোচনায় গোদা সমাজবাস্তবতা-জাতীয় এক অলীক জবাকুসুমের গল্প, অথচ, হরিমোহন কর্মকার-এর 'মাগ-সর্ব্বস্ব', প্রসন্নকুমার পাল-এর 'বেশ্যাসক্তিনিবর্ত্তক নাটক', তারকচন্দ্র চূড়ামণির 'সপত্নী নাটক', ঈশ্বর সরকারের 'গোপন বিহার' বা হরিশচন্দ্র মিত্র-র 'ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে'-র মতো বইপত্রও যে সেদিন লেখা হয়েছিল, যাদের এককথায় 'বটতলার বই' বলে মার্কা মেরেই আমরা নিশ্চিন্ত থেকেছি, সেই বিপুল আর্কাইভকে যে তাত্ত্বিক কাঠামোয় বাঁধা সম্ভব, শ্রীপান্থ-র অসাধারণ বইগুলিও যে শেষ অব্দি বিবরণমূলক আখ্যানেই সীমাবদ্ধ থাকে, কোনো বিকল্প তাত্ত্বিক পরিকাঠামোর জন্ম দেয় না, এই কথাগুলো বলার মতো সাহস আমার সেদিন ছিল না, হয়তো আজও নেই, তবু খানিকটা ভিতরে ঢুকতে পারার সুবাদে পুরো বিষয়টির একটা তাত্ত্বিক ফ্রেম আস্তে আস্তে মাথার মধ্যে জন্ম নিচ্ছিল সেদিন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ন্যাশনাল লাইব্রেরি, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরি, চৈতন্য লাইব্রেরি-র ধুলোপড়া, পোকায় কাটা, হলুদ হয়ে যাওয়া এইসব বইয়ের মায়ায় জড়িয়ে যেতে লাগলাম একটু একটু করে। লন্ডনের 'ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি'-তে বা অন্যত্র যাবার সুযোগ আমার হয়নি এখনও অব্দি, হয়তো কোনো দিন আসবে সেই সুযোগ, তবে আমাদের চারপাশের লাইব্রেরিগুলোতে যে পরিমাণ উনিশ শতকের এধরনের প্রহসন, নাটক, পুস্তিকা, ট্র্যাক্ট, এখনও রক্ষিত আছে, তাও খুব একটা কম নয়। আজকের কালচারাল স্টাডিজের আলোচনায় যদিও 'হাই কালচার' আর 'লো কালচারে'র পার্থক্যকে খুব একটা আমল দেওয়া হচ্ছে না, তবু, আমার অনুসন্ধানের জন্য যে এই তথাকথিত 'লো লিটারেচারে'রই দ্বারস্থ হওয়া দরকার, সেটা খুব স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল।

একেবারে শুরুর দিকেই যে দু'জন মানুষের অকৃপণ সাহচর্য ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহায়তায় আমার গবেষণার কাজ সহজ হয়ে উঠেছিল, তাঁদের কেউই বাংলা ডিসিপ্লিনের মানুষ নন। এঁদের একজন অধ্যাপক শ্রীগৌতম ভদ্র ও অপরজন অধ্যাপক শ্রীমানস রায়। দুজনেই রীতিমতো খ্যাতিমান, 'সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন স্যোশাল সায়েন্সেস'-এর জনপ্রিয় অধ্যাপক ও গবেষক। গৌতমবাবু দরাজ হাতে জুগিয়েছেন অজস্র বইপত্র, বিশেষত বিদেশি রেফারেন্স বই, যা সেই মুহূর্তে আমার পক্ষে নিজে জোগাড় করা প্রায় অসম্ভব ছিল। মনে আছে তিনি আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন টমাস ল্যাকার-এর লেখা 'সলিটারি সেক্স: দ্য কালচারাল হিস্ট্রি অফ মাস্টারবেশন' বইটি, যা হাতে পেয়ে রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম বললেও কম বলা হবে। আর মানসদার কাছে আমি যে কতো রকম ভাবে ঋণী, তা উনি নিজেও জানেন না। নিজের ব্যক্তিগত লাইব্রেরি উজাড় করে দিয়েছিলেন তিনি সেদিন, আমার মতো এক অর্বাচীনের সামনে, দিয়েছিলেন মিশেল ফুকোর উপর ছ'খন্ডের একটি অনারারি গ্রন্থের সেট। আমিই অক্ষম বলে এই দুজন মানুষের সাহায্য, আশ্বাস ও ভালোবাসার মর্যাদা রাখতে পারিনি পরবর্তী জীবনে। আমার ব্যক্তিগত জীবন এতোরকম টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে, যে, শুরু করা কাজ যে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তা খুব ধীর গতিতে এগিয়েছে, কখনও বা সাময়িকভাবে গতিরুদ্ধ হয়েছে। পি.এইচ.ডি পেয়েছি ২০০৯ সালে, উনিশ ও বিশ শতকের বাঙালির যৌনতা নিয়ে অন্তত এক ডজন সুদীর্ঘ, নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছি নামী জার্নাল, সাময়িকপত্র ও খবরের কাগজে। বেরিয়েছে 'পর্নোটোপিয়া' নামের একটি বই যার জনপ্রিয়তা ও বিক্রির পরিমাণ অবিশ্বাস্য। দীর্ঘ তাত্ত্বিক ভূমিকা সহ সম্পাদনা করেছি 'যৌনতা ও বাঙালি', তিন খন্ডে 'দুষ্প্রাপ্য বাংলা সাহিত্য', সটীক সংস্করণ 'হরিদাসের গুপ্তকথা'। লিখেছি এছাড়াও বেশ কয়েকটি বই, যেগুলোর ভিতর কোনো না কোনোভাবে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতি, পপুলার কালচারের হাল-হকিকত, বাঙালির যৌনতার ইতিহাসের টুকরো ভগ্নাংশে ঠাঁই পেয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে চেষ্টা করছি, গবেষণাপত্রটিকে পূর্ণাঙ্গ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বইয়ের চেহারা দিতে। কিন্তু কাজ যত এগোচ্ছে, তথ্যের প্রাবল্য ততো বেশি করে বাড়ছে আর নতুন গবেষকদের কাজকর্ম যত বেশি করে প্রকাশিত হচ্ছে, আমার চিন্তার গতিপথও পাল্লা দিয়ে বদলাচ্ছে, সমৃদ্ধ হচ্ছে। কাজেই আরও খানিকটা সময় নিতে বাধ্য হচ্ছি। উনিশ শতকের গোড়া থেকে শুরু করে বিশ্বায়নের মুখোমুখি দাঁড়ানো বাঙালির যৌনতার ডিসকোর্স কীভাবে নিজের গতিপথ বদলেছে, এটাই হবে সেই পূর্ণাঙ্গ বইয়ের প্রতিপাদ্য।

বাঙালির উনিশ শতকীয় 'আধুনিকতা' নিয়ে আলোচনা করতে হলেই চালচিত্রের মতো পিছনে এসে দাঁড়াবে ইউরোপ। কারণ, ইউরোপীয় 'আধুনিকতা'-র সংস্পর্শে এসেই বাঙালির নিজস্ব আত্মপরিচয় খোঁজার সূচনা। যৌনতা-সংক্রান্ত 'আধুনিক' ডিসকোর্স গড়ে উঠেছিল দাম্পত্য, নারী-পুরুষ সম্পর্ক, গৃহস্থালি, সন্তানপালন, শিশুর যৌনবোধ বিকশিত হওয়া ও তাকে নিয়ন্ত্রণ করার 'আধুনিক' পদ্ধতি, ব্যক্তির চরিত্রগঠন, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, পোশাক, বিশেষত মেয়েদের পোশাক সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা, লিখিত ও মৌখিক ভাষা-ব্যবহারের মধ্য থেকে তথাকথিত 'অশ্লীলতা'-বর্জনের আলোচনা প্রভৃতি বিষয়কে জড়িয়ে এক বিপুল ও বিস্তৃত জ্ঞানভান্ডার গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে। ইউরোপীয় প্রেক্ষিতটি মাথায় রাখলেও বোঝা যায়, আঠারো-উনিশ শতক জুড়ে পাশ্চাত্য ইনটেলিজেনশিয়ার কাছে যৌনতা ছিল একটি 'আবিষ্কার'। রিফমের্শন-পরবর্তী পাশ্চাত্য খ্রিস্টধর্মে এই সময় থেকেই যৌনতা ও ব্যক্তিচরিত্র হয়ে ওঠে সমার্থক। খ্রিস্টীয় 'কনফেশন'-মডেলটি এক বিস্তৃত পপুলার ন্যারেটিভের চেহারা পায়, যেখানে 'যৌন-সত্য' উচ্চারণই হয়ে ওঠে ব্যক্তির 'আত্ম' বা 'সেলফ'-এর সমার্থক। ফুকোর ভাষায় 'we have since became a singularly confessing society'। পাশাপাশি, সতেরো শতক থেকেই পুঁজিবাদী নাগরিক সমাজের বিকাশ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক ডিজায়ারকে খ্রিস্টীয় চার্চ-প্রবর্তিত রক্ষণশীলতার বিপরীতে রাখা, কন্ডোম ব্যবহার ও গর্ভপাতের রমরমা, বিশেষত উচ্চবিত্ত সমাজ ও সেই সূত্রে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যান্য অংশের ভিতরেও একধরনের 'লিবারটাইন' জীবনধারার প্রচলন ক্রমেই চার্চের আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছিল। একইসঙ্গে যৌনতার নৈতিকতা, যৌনরোগ সম্পর্কে সচেতনতাবিষয়ক বইপত্রের ছাপার বিপুল বৃদ্ধি একধরনের ক্লিনিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গিরও জন্ম দেয়, যা, যৌনতার নতুন ডিসকোর্সের সূচক হয়ে দাঁড়ায়। এই ক্লিনিক্যাল ডিসকোর্সের একটি অন্যতম নিদর্শন ১৭১২ সালে হস্তমৈথুন-বিষয়ক প্রথম বইটি ছাপা হওয়া, যার দীর্ঘ নামের শুরুর দিকটি ছিল এইরকম : 'Onania; or the Henious Sin of Self Pollution'। এই প্রথম, খ্রিস্টীয় নৈতিক ব্যাখ্যার বাইরে বেরিয়ে এসে হস্তমৈথুনকে একটি ক্লিনিক্যাল সমস্যা হিসেবে গণ্য করা হতে লাগল। কিন্তু, সেই ক্লিনিক্যাল দৃষ্টিকোণের ভিতরেও মিশে গেল বিভিন্ন ছদ্ম বৈজ্ঞানিক উৎকণ্ঠা। উন্মাদনা; গনোরিয়া, মৃগীরোগ, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতির উৎস হিসেবে চিহ্নিত হতে লাগল হস্তমৈথুন। আবার নারীর হস্তমৈথুনকে পৃথকভাবে ক্যাটেগোরাইজ করা হতে লাগল এবং তা নিয়েও বিবিধ অনুমান ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হতে লাগল। অস্তিত্বের উৎসে পৌঁছনো, ব্যক্তির গোত্রবিচার, বংশগতি, অধঃপতনের ধারাবাহিকতা অনুসন্ধান, অন্যদিকে, যৌনতাকে জনস্বাস্থ্য, বেশ্যাবৃত্তি, পাবলিক হাইজিন, যৌনরোগের প্রতিষেধক ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে দেখা হতে থাকে, অর্থাৎ, পাবলিক পরিসরে যৌনতাকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রিক হস্তক্ষেপ চলতে থাকে, যাকে সামগ্রিক ভাবে ফুকো 'বায়োপাওয়ার' আখ্যা দিয়েছিলেন। ক্রমশ, মেডিক্যাল পরিসর ছাপিয়ে অন্যত্রও 'সেক্সুয়ালিটি' শব্দবন্ধটি ব্যবহৃত হতে থাকে। উনিশ শতকের শেষদিকে পৌঁছে 'যৌনতা' একটি সামগ্রিক বর্গ হিসেবে 'উদ্ভাবিত' হয়। আর যৌনতা ও ক্ষমতা যেহেতু অঙ্গাঙ্গী জড়িত, তাই যৌনতাকে কেন্দ্র করে পুরুষতন্ত্র নতুন করে লিঙ্গ পার্থক্যের ধারণাটিকে সামনে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠিত করে। পুরুষের যৌনতা আগ্রাসী আর নারীর যৌনতা শুধুমাত্র 'রিসেপটিভ', মেয়েদের যৌন অতিরেক 'হিস্টিরিয়া'-র জন্ম দেয়, সেই যৌন উচ্ছ্বাসকে প্রতিহত না করতে পারলে সামাজিক সুস্থিতির বনিয়াদটাই ধসে পড়বে, এই ধারণার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্ম হয়, যা বেড়ে যায় ইংল্যান্ডে ১৮৫৭ সালের ডিভোর্স আইন পাশ হবার পর। বিষমকামী যৌনতাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য, সমকামিতা একধরনের 'অস্বাভাবিক' রোগ— এই ধারণাও 'বৈজ্ঞানিক' মোড়কে পরিবেশিত হতে থাকে, পাতার পর পাতা লেখা হয় এই তত্ত্বকে মান্যতা দিতে। আমরা উনিশ শতকের বাংলায় যৌনতার এই ক্যাটেগরিগুলোকেই বিভিন্ন রূপে, দেশীয় চেহারায় দেখতে পাই, যাকে পার্থ চট্টোপাধ্যায় 'বর্ণসংকর' জ্ঞানতত্ত্ব হিসেবে অভিহিত করেছেন একাধিক জায়গায়। যদিও প্রতিটি ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্য থেকে আত্মস্থ করা জ্ঞানকাঠামোর দেশীয় স্থানাঙ্ক খোঁজার চেষ্টা জারি থেকেছে। অর্থাৎ, যৌনতার ক্ষেত্রেও কাজ করেছে পাশ্চাত্যের হুবহু অনুকরণ নয়, বরং আমাদের নিজস্ব 'আধুনিকতা'-র অনুসন্ধান।

এই বইটি আমার বিভিন্ন সময়ে লেখা তিনটি প্রবন্ধের সংকলন। যৌনতা বিষয়ক প্রায় সব বয়ানই যেহেতু পুরুষের লেখা, আমাদের উনিশ শতকে তা আরও সত্য, যেহেতু, সর্বজনীন শিক্ষা, মতপ্রকাশের অধিকার, নিজেদের ডিজায়ারের বিবরণ মেয়েরা সেযুগে তো বটেই, আজও বলে উঠতে পারে না, তাই তাদের যৌনতার ভাষ্য খুঁজতে হবে পুরুষের লেখা বয়ানকেই উল্টোভাবে পড়ে। চাঁদের ওপিঠের অন্ধকারের মতোই উনিশ শতকের অবরোধবাসিনী মেয়েদের ডিজায়ার কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে আমাদের চেনা অচেনা উচ্চারণে, তারই একটা খোঁজ প্রথম লেখাটি। ব্যবহার করেছি 'সম্বাদ রসরাজ' পত্রিকার পুরোনো ফাইল, জানা অজানা বেশ কয়েকটি প্রহসন, যেখানে মেয়েদের শরীর-যৌনতার উচ্চারণ, সোচ্চার ঘোষণা পুরুষতন্ত্রের চেনা থাকবন্দে রীতিমতো অন্তর্ঘাত ঘটায়। যেমন, সেদিনকার বিয়ের রাতে বাসরঘরের চেহারা, যেখানে, সদ্যবিবাহিত বরকে নিয়ে বউ-এর সঙ্গিনীদের সমবেত হাসিঠাট্টা, শরীরী ইঙ্গিতপূর্ণ অশ্লীল ঠাট্টা-ইয়ার্কি, যা, সেদিনের ইংরেজিশিক্ষিত পুরুষতন্ত্রের ঠিক বিপরীত এক সম্পূর্ণ ভিন্ন সমান্তরাল সংস্কৃতির চেহারা তুলে ধরে। কুলীন পরিবারের অবরোধবাসিনী মেয়েদের অবদমিত শরীরী আকাঙ্ক্ষা যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোরাগোপ্তা পথে নিজেকে প্রকাশ করত, তার চেহারাও পাওয়া যায় এখানে। দ্বিতীয় প্রবন্ধের বিষয় মেয়েদের পোশাকের ডিসকোর্স, কীভাবে তথাকথিত 'আলোকিত' নব্যযুগে মেয়েদের উপযোগী পোশাক পরিকল্পনা হয়ে উঠল জাতীয়তাবাদী পুরুষতন্ত্রের পরিসরে ক্ষমতার সঙ্গে মেয়েদের নিজস্ব বোঝাপড়া, আবার একইসঙ্গে পুরুষতন্ত্রের বয়ানের ভিতর মেয়েদের নিজস্ব আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি। তৃতীয় প্রবন্ধটি নিয়ে দু'একটি কথা বলতে চাই একারণেই, যে, গবেষণাপর্বের একেবারে সূচনালগ্নে এটিই আমার প্রথম পূর্ণাঙ্গ রচনা। যখন, সংগৃহীত তথ্যাদি অত্যন্ত সীমিত, একটি প্রাথমিক তাত্ত্বিক কাঠামোর আভাস সবেমাত্র গড়ে উঠতে চলেছে। আমার কাছে এই লেখাটির আজ শুধুমাত্রই গুরুত্ব এখানে, যে, একটি চেনা প্যাটার্নে আমি আমার ভাবনাগুলোকে সাজাতে শিখছিলাম তখন। এবং, সেই ভাবনার ধরনটি যে আজ পুরোপুরি বাতিল হয়ে গিয়েছে, তাও নয়। তবে পরবর্তী সময়ে আমার নিজের লেখাতেই ওই লেখার অনেক বক্তব্য খন্ডিত হয়েছে। সবিনয়ে জানাই, প্রথম প্রবন্ধের নাম অনুসারেই এই বইয়ের নামকরণ করা হয়েছে।

পরিশেষে বলি, এই বই একেবারে সাধারণ পাঠকদের জন্য। গবেষক-পন্ডিতদের কথা ভেবে লেখা নয়। বেশ কিছু জায়গায় একই তথ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, স্বাভাবিক ভাবেই। উদ্ধৃতির ভিতর পুরোনো বানান অবিকৃত রাখা হয়েছে। একটি স্বাদু, তথ্যপূর্ণ, সহজ বই তুলে দিতে চেয়েছি পাঠকের হাতে। সেটুকু সফল হলেই আমার চেষ্টা সার্থক হবে বলে মনে করি।

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি ২০১৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূ চি প ত্র

উনিশ শতকে
বাঙালি মেয়ের যৌনতা ১৯
উনিশ শতক
বাঙালি মেয়ের পোশাক-ভাবনা ৪৫
উনিশ শতকের
বাংলায় শরীর- যৌনতা- অশালীনতার এলাকা নির্মাণ ৭৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উনিশ শতক বাঙালি মেয়ের যৌনতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উনিশ শতকে বাঙালি মেয়ের যৌনতা

চিদানন্দ দাশগুপ্ত পরিচালিত 'আমোদিনী' ছবির সেই দৃশ্যটি মনে পড়ছে? অন্দরমহলে মেয়েদের কেশকর্তন করতে নাপিতিনী এসেছে জমিদারবাড়িতে। একটি মেয়ের বগলের লোম কামিয়ে দিয়েছে নাপিতিনী। অতঃপর হাওয়ায় উড়ছে সেই কর্তিত কেশগুচ্ছ। আর তাই নিয়ে মেয়েমহলের সমবেত উচ্ছ্বাস। আসলে বড়োবাড়ির অন্তঃপুরে সেদিন যার-তার প্রবেশাধিকার ছিল না। নাপিতিনীর মতো চরিত্ররাই সেদিন সচ্ছন্দে প্রবেশ করত সেখানে। শরীরের গোপন অঙ্গের হদিশও উন্মুক্ত হত এই নাপিতিনীদের কাছেই। উনিশ শতকের জ্ঞান-যুক্তি-আলোকায়নের দাপটে এই অন্তঃপুরচারিনীদের নিজস্ব জীবনযাপন-অভিব্যক্তি-হাসিকান্নার মুহূর্তগুলিকে এককথায় 'অপরিশীলিত', 'পশ্চাৎপদ', 'না-আলোকিত' বলে দেগে দেওয়া হয়েছে। যেন প্রাক্-আলোকপর্বের অন্তঃপুরচারিনীদের জীবন ছিল সর্বার্থেই ভয়াবহ অন্ধকার, অবদমনের জগৎ। আর ধীরে ধীরে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, পাশ্চাত্য প্রভাবের সমন্বয়, বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ তাদের সেই এনলাইটেনমেন্টের শরিক করে তুলল, যার ফলে তারা অবরোধের প্রাচীর ভেঙে এক নতুন উন্নয়নমুখী জীবনবোধের অংশীদার হয়ে ওঠে। কিন্তু শরীর-যৌনতার প্রসঙ্গ যদি বলতে হয় তবে এটা অনস্বীকার্য, ভিক্টোরীয় নৈতিক মূল্যবোধ এবং দেশীয় উচ্চবর্ণীয় যৌনতার মরাল কোডগুলি ক্রমশ কার্যকর হতে শুরু করার পর, দেশীয় মেয়েমহলের অন্তঃপুরের যৌনতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উনিশ শতকে বাঙালি মেয়ের যৌনতা ২০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিব্যক্তি, বহিঃপ্রকাশ নিঃসন্দেহে অনেক বেশি স্ট্রিমলাইন্‌ড হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে আলোকপ্রাপ্ত পুরুষের লেখা বয়ানগুলিকে উল্টো করে পড়া দরকার। এনলাইটেনমেন্ট বাঙালি সমাজের অতি ক্ষুদ্র অংশকেই প্রভাবিত করেছিল। তাই উনিশ শতকের মেয়েদের যৌনতা সেদিন কেবল অবদমিতই হত, এটা খণ্ডিত সত্য। অবদমন সবসময়ই ফাঁক-ফোকর খুঁজে নেয়, নিজস্ব আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধন করে। ফলে চেনা বয়ানের ভিতর অন্তর্ঘাত ঘটে। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজকাঠামো অন্তঃপুরিকা মেয়েদের জন্য গড়ে তুলেছিল হাজারো বিধিনিষেধ, তাদের শরীর-মনের চাহিদার যথাযথ হদিশ রাখত না পুরুষতান্ত্রিক সমাজ, তবুও সেই অনুশাসনের নিগড়ের ভিতরেও নিজস্ব ভঙ্গিতে কথা বলেছে মেয়েদের শরীর। সেই উচ্চারণের ইতিহাস পুনরুদ্ধার করা আজ প্রায় অসম্ভব। কারণ মেয়েদের নিজস্ব কলমে তার সাক্ষ্য পাওয়া প্রায় দুর্লভ। বরং এক্ষেত্রে পুরুষ-রচিত ন্যারেটিভগুলিকে উলটো করে পড়লেই তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং অভিব্যক্তির এক খণ্ডিত ছবি হয়তো পাওয়া যেতে পারে।

এক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু সূত্র দিয়েছেন মেরিডিথ বর্থউইক। উনিশ শতকের মেয়েদের ক্রমপরিবর্তনের ইতিহাস আঁকতে গিয়ে তিনি প্রথমেই গ্রাম-শহরের পার্থক্য করেছেন। তাঁর মতে উনিশ শতকের কলকাতায় যে আলোকপ্রাপ্ত নাগরিক সভ্যতা গড়ে উঠল সেখানে 'গার্হস্থ্য পরিবার' হয়ে উঠল এক বিশেষ ধরনের 'ক্ষমতা' এবং সামাজিক প্রতিপত্তির 'ক্ষেত্র'। এই পবিত্র পারিবারিক ক্ষমতাকেন্দ্রটিকে স্যানিটাইজ্‌ড রাখার জন্য মেয়েদের নিজস্ব বাচনভঙ্গি, আমোদ-আহ্লাদ, পোশাক-আশাক, এমনকি হাঁটা-চলার পদ্ধতির উপরেও নিয়ন্ত্রণ এবং নজরদারি প্রয়োগ শুরু হল। গ্রামের মেয়েরা কিন্তু অনায়াসেই রাস্তায় বেরোত, উন্মুক্ত পুকুরঘাটে খোলামেলাভাবে স্নান করত, ভদ্র গৃহস্থঘরের মেয়েরাও জেনানামহলে ধূমপান করত। তাঁদের আকঁড়া কথাবার্তার উপরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোকপ্রাপ্তির সিলমোহর লাগানো হয়নি। কিন্তু এই আপেক্ষিক স্বাধীনতা রীতিমতো খর্ব হত কলকাতার শিক্ষিত পরিবারগুলিতে। গ্রামের মেয়েরা পুকুরে-নদীতে যেতে পারত, সেরকম বাধা ছিল না, কিন্তু কলকাতার ভদ্রবাড়ির মেয়েরা প্রকাশ্য দিবালোকে গঙ্গাস্নানে যেতেন না। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের পালকিসুদ্ধ গঙ্গায় স্নান করিয়ে আনার কথা তো সকলেই জানেন। পুরুষতন্ত্রের নিজস্ব সম্ভ্রম বজায় রাখার একটি উপকরণ মেয়েদের শরীর যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ করা—এই বোধ ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণ নজরদারির নিরন্তর প্রক্রিয়া সত্ত্বেও, এমনকি কলকাতার চূড়ান্ত আলোকপ্রাপ্ত পরিবারগুলোতেও অন্তঃপুর বা জেনানামহলগুলি ছিল মেয়েদের একান্ত নিজস্ব ভুবন। অনেক চাপ সত্ত্বেও একধরনের আপেক্ষিক স্বাধীনতা সেখানে জারি ছিল মেয়েদের। এ যেন এক স্বতশ্চল, স্বয়ংক্রিয় নারী সাম্রাজ্য, যেখানে পুরুষের বহির্জগতের ইংরেজি জানা রুচি, ভিক্টোরীয় কোডগুলি ততোটা মান্যতা পেত না। সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম শেষ করে মহিলারা নিজেদের মতো করে অবসর উপভোগ করতেন অপরাহ্নে। বসত তাসপাশার আসর, ধূমপান, নিজেদের ভিতর একান্ত গোপন কথাচালাচালি, কেচ্ছাকেলেংকারির আলোচনা, বিচিত্র নিজস্ব ক্রিয়াকলাপ। সবচেয়ে বড়ো অন্তর্ঘাতমূলক কাজ ছিল মেয়েদের ভাষা ব্যবহার। ভিক্টোরীয় পুরুষের তৈরি করা শালীনতার বেড়া ভেঙে বিনোদনের অঙ্গ হিসেবে মেয়েরা অনায়াসেই ব্যবহার করতেন মুখখিস্তি, অশ্রাব্য গালিগালাজ। আর এইসব খিস্তির প্রত্যেকটাই হত যৌন অনুষঙ্গে ভরপুর। অন্তঃপুরের বাঙালি মহিলাদের অবসর বিনোদনের প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সবচেয়ে বেশি বিবরণ রেখে গেছেন ইংরেজ মিশনারিরা। এবং তাদের বিবরণ পুরোটাই নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা। অর্থাৎ মিশনারি নারী-পুরুষেরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যখন বর্ণনা দিচ্ছেন তখন মেয়েদের স্বতঃস্ফূর্ত আচরণকে কাম্য নৈতিকতার স্ট্যাণ্ডার্ড থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক ধরনের প্রবল বিচ্যুতি হিসেবে দেখা হচ্ছে। যেমন রেভারেণ্ড স্টরো তাঁর *The Eastern Lily Gathered* বইতে লিখেছেন এক জেনানামহলের বৃত্তান্ত, যেখানে মহিলারা অলস ভঙ্গিতে, অশোভনভাবে শুয়ে-বসে আছে মেঝেতে বা সোফায়, চাকরেরা তাদের হাত-পা টিপে দিচ্ছে। তারা নিজেদের ভিতর অশ্লীল আলাপ-আলোচনায় মত্ত। এইচ্ অ্যাশমোর নামক জনৈক মিশনারি তাঁর *Narratives of a Three Months March in India* বইতে লিখেছেন ধনী পরিবারে বাঙালি মহিলারা পর্দা বা চিকের আড়াল থেকে কী অপরিসীম উৎসাহে বাইনাচ দেখছে এবং নিজেদের ভিতর সেই নাচ নিয়ে আলোচনা করছে। উনিশ শতকের গোড়ায় ফ্যানি পার্কস যখন কলকাতার একাধিক অভিজাত পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করেন, তখন বাঙালি মহিলাদের কথাবার্তা, প্রশ্ন করার ধরন, তাঁর কাছে কুরুচিকরও অপরিশীলিত বলে মনে হয়। একাধিক প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় মেয়েমহলে 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যপাঠ এবং রসগ্রহণের বিপুল প্রচলনের উল্লেখ পাওয়া যায়। এমনকি ঠাকুরবাড়ির মহিলারাও 'বিদ্যাসুন্দর' পড়তেন। মনে রাখতে হবে ভারতচন্দ্রের এই কাব্য উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই চূড়ান্ত যৌন উত্তেজক অশ্লীল পাঠ্য হিসেবে বিবেচিত হতে শুরু করে। অধিকাংশ সাক্ষ্য থেকেই জানা যায় অন্দরমহলের মেয়েদের মৌখিক বুলি ছিল রীতিমতো যৌন অনুষঙ্গে ভরা। ১৮৩৯ সালে জনৈক ইংরেজ মিশনারি মহিলা এদেশীয় বাঙালি জেনানামহল সম্পর্কে মন্তব্য করছেন; এখানকার মেয়েরা "will sat for hours in circles willing away the time in silly obscene conversation"। একটা তীব্র অবদমনপ্রবণ সমাজে যেখানে মেয়েদের শরীর-যৌনতার স্বাধীন অভিব্যক্তি ঘটানোর সুযোগ প্রায় ছিলই না, সেখানে এধরনের মৌখিক বুলির মধ্য দিয়েই অবদমিত কামনা-বাসনার তীব্র বহিঃপ্রকাশ ঘটত। এমনকি, মেরিডিথ বর্থউইক দেখাচ্ছেন, পুরুষের উপর চাপ সৃষ্টির, পুরুষকে বশে রাখার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৌশল হিসেবেও মেয়েরা শরীরকে ব্যবহার করতে জানত। কখনও কখনও তারা স্বামীকে যৌনতৃপ্তি দিতে অস্বীকার করত, অর্থাৎ সঙ্গমে বাধা দিত, এর মধ্য দিয়েও এক ধরনের যৌন স্বাধীনতার ক্ষীণ প্রকাশ ঘটাত তারা।

মেয়েদের অবদমিত কামনা-বাসনার এক তির্যক বহিঃপ্রকাশ ঘটত বিভিন্ন ধরনের স্ত্রী-আচারের সাপেক্ষে। যেমন বাসরঘরে নববিবাহিত বরকে নিয়ে শালীদের যৌনতায় ভরপুর ঠাট্টা-ইয়ার্কি। এর মধ্য দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চেনা ক্ষমতাকাঠামোর চেহারাটি উলটে যাচ্ছে। সামান্য এক রাতের জন্য হলেও পুরুষটিকে যৌনতার প্রকৌশলে বেকায়দায় ফেলা হচ্ছে। উনিশ শতকের একাধিক 'বাসরসংগীত' জাতীয় বইতে এধরনের রিচুয়ালের অনুপুঙ্ক্ষ বিবরণ পাওয়া যায়। যেমন শ্যামাচরণ দে রচিত *'বাসরকৌতুক নাটক'* (১৮৫৯)। অল্পবয়স্ক বরকে নিয়ে ফুলশয্যার রাতে স্ত্রীর পরিবারের বিভিন্ন বয়সী ১৩ জন মহিলার বদ ঠাট্টা রসিকতা এই নাটকে ঠাঁই পেয়েছে। এই নাটকে স্ত্রীর অবিবাহিতা সইরা দাবি করেছে তাদের অশ্লীল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে বর তাদের যে কাউকে সেই রাতের শয্যাসঙ্গিনী হিসেবে পেতে পারে। এক মুখরা রমনী জামাইকে যেভাবে সম্বোধন জানায়, তার ভিতর শরীরী ইঙ্গিত রয়েছে :

আহামরি কিবা রূপ হায় হায় হায়।
চাইতে নয়ন-পঙ্ক্ষ বুঝি খোসে যায়।।
কিবা ঊরু কিবা ভুরু কিবা আঁখি ধার।
যেন মার মারিতেছে শর আপনার।।
অমাবস্যা-নিশির শশীর সম প্রায়।
এরূপ স্বরূপ রূপ কে দেখেছে হায়।।

অঞ্জনা-নাম্নী কনের এক সখী বরের সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে গেলে সখী সুলোচনা তাকে ভর্ৎসনা করে বলে : "ওলো অঞ্জনা। তুই করিস্ কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লো? তুই যে এক্‌বারে পর্চ্চোয় না দিতে দিতেই ওর প্রেমে গোলে গেলি। এর সঙ্গেই তোর পরপুরুষের এত ভাল লাগলো লা, না জানি পরে ভাল হোলে তুই আর কত কোর্ব্বি।" এরপর সুলোচনার পদ্যে উক্তি :

কেনলো অঞ্জনা এমন হোলি।
অপর পুরুষে প্রেমেতে টোলি।।
কিসেতে ইহাকে দেখিলি ভাল।
শাদাকে করিতে পারিসো কাল।।
ছিছিলো এতই উতলা কেন।
মজিলে প্রেমে কি থাকে না জ্ঞান।।
কিভাবে ভাবিয়ে পাইলি রস।
এখনি হইলি ইহার বশ।।

ইতিমধ্যে বরকে ফাঁদে ফেলতে আসরে হাজির হয়েছে প্রেমবিলাসী। তার জবরদস্ত উক্তি : "দেখ্ কামিনি। তুই ভাই মিন্‌সের ডান পাশে বোস্, আমি বাঁ পাশে বোসি। আর বকুলফুল, তুই সুমুকে বোস ভাই। তা হোলে শালার তবু তিনদিক আটক রইলো, শীঘ্র পালাতে পার্ব্বে না।" এরপর একাধিকবার উপস্থিত নারীদের প্রশ্নের জবাবে স্ত্রীচরিত্র সম্পর্কে বর যে উক্তি করে, তার ভিতর দিয়ে অন্দরমহলের মেয়েদের পুরুষকে বশে রাখার কৃৎকৌশল প্রকট হয় :

পরাধিনী নারী বটে, সুচতুরা অতি।
চমকে ধমকে চলে যেন গজ-গতি।।
ঘোমটা ভিতরে খেলে খেমটার নাচ।
বুকেতে বাঁধিয়া রাখে অনঙ্গের ছাঁচ।।
নিতম্ব কটাক্ষে তার প্রণয়ের পাশ।
'বিদ্ধিদাতা' বলি পাতা আছে বারো মাস।।
এপাশে সহসা পড়ে পুরুষের মন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশ্য হইল ইথে তাহার হরণ।।

যখন রাত প্রায় ফুরিয়ে আসছে, সমবেত স্ত্রী-মহলের সঙ্গে বরের বাক্-যুদ্ধ পরিসমাপ্ত প্রায়, মহিলারা এই বরের প্রতি রীতিমতো আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। সারারাত বরের সান্নিধ্য ভোগ করার পর আসর যখন শেষ হবার মুখে, তখন সর্বগুণসম্পন্ন বরকে ছেড়ে চলে আসতে হবে এই ভেবেই কাতর হয়ে পড়ে বাসরঘরের নায়িকারা। তারা ভোরের আলোকে অভিসম্পাত দেয়। তাদের সমবেত আক্ষেপোক্তিও তীব্রভাবে শরীর-কেন্দ্রিক :

কি কাল হইল আজি বাসরে করি গমন।
হেরিয়া নাগর-রূপ মজিল মম নয়ন।।
সুঠাম শরীর কিবা মুখে মৃদু হাসি।
লাবণ্য ছটায় মোরে করিল উদাসী,
মধুর ভারতী যেন মৃগ অভিলাষী,
উহু, মরি ধর ধর দেখে হই অচেতন।
পলকে প্রলয় জ্ঞান আর মুখ অদর্শনে,
রজনী পোহালে সে তো যাইবে নিজ ভবনে,
এ বিরহ বাণ আমি প্রাণে সহিব কেমনে,
বুঝি সংশয় জীবন।।

অবদমিত শারীরিক-মানসিক আকাঙ্ক্ষার এ যেন এক তির্যক অভিব্যক্তি। ভিক্টোরীয় রুচিবাগীশ শিক্ষিত পুরুষের চোখে সেদিনকার বাসরঘরের মেয়েদের এই ধরনের প্রচলিত আচার ছিল পুরোদস্তুর শিক্ষার আলোহীন পিছিয়ে থাকা নারীসমাজের আচরণগত বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু 'বাসরসংগীত'-জাতীয় বইয়ের বিক্রি ছিল সেদিন ঈর্ষনীয়। প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত শ্যামাচরণ শ্রীমাণির (১৮৬০) *'বাল্যোদ্বাহ নাটক'-এ* জনৈক বিদ্যাহীন, নির্বোধ বর শালীদের অশ্লীল ঠাট্টা-রসিকতায় খুবই আমোদ পাচ্ছে। কারণ :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদর করিয়া কত শালী লয় কোলে।
বড় বড় মাছ খায় ঝালে আর ঝোলে।।
কত মত কথা শেখে নানারঙ্গ রস।
যাহাতে করিবে পরে রমনীরে বশ।।
ধারে ধারে কণেটির মুখ পানে চায়।
আধো আধো হাসি দেখে নয়ন জুড়ায়।।
ঘুম পাড়াইতে আসে কত কুলনারী।
রতিশাস্ত্র শিখাইতে বসে সারি সারি।।
কোমল কামিনী কর গাত্রেতে বুলায়।
কি কহিব স্মরণেতে দুঃখ দূরে যায়।।
তাই বলি এ অপেক্ষা সুখ কিবা আছে।
করো না ইহার নিন্দা লোকে নিন্দে পাছে।।

অর্থাৎ, জেনানামহলের অন্দরের অবরোধ সেদিনের বৃহত্তর বাঙালি মেয়েকে মূক, ভাষাহীন, ভাগ্য এবং লাঞ্ছনার অন্যায় শিকার বানিয়ে রেখেছিল, একথা ভাবা একপেশে হবে। শরীর-যৌনতার বহিঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে সমাজ পুরুষকে যে সুযোগ দিত, পুরুষের জন্য যতটা পারমিসিভ ছিল, মেয়েদের ক্ষেত্রে বলাই বাহুল্য, তা ছিল না। উপরোক্ত উদাহরণগুলোই তার প্রমাণ। দৈনন্দিন পরিসরে, অন্তত বাচিক ভঙ্গি মায়, আচরণ-অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে মেয়েরা যে নিজেদের লুকোনো বাসনা-কামনা প্রকাশ করতে পারত। এটা নিশ্চিত।

২

উনিশ শতকের সাধারণ বাঙালি সমাজে পুরুষ সহজেই তার স্বাভাবিক যৌনতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা মেটাত পরিবার বা পরিবার-বহির্ভূত সম্পর্ক দ্বারা অথবা গণিকালয়ের নগদ যৌনতা তার অতৃপ্ত কামনাকে শান্ত করত। কিন্তু মেয়েদের অবস্থা ছিল অনেক বেশি সমস্যাসঙ্কুল ও জটিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরুষের মতো অতি সহজেই বহির্গামী হবার সুযোগ তাদের ছিল না বলে অধিকাংশ মেয়েকেই অবদমিত, অতৃপ্ত যৌনতার আগুনে পুড়ে মরতে হত আজীবন। কঠোর রক্ষণশীল পুরুষতান্ত্রিক সমাজ মেয়েদের মানসিক চাহিদাগুলো যেমন বোঝেনি, তেমনই তাদের শারীরিক আকাঙ্ক্ষারও কোন খোঁজ রাখতে চায়নি। অথচ বাল্যবধূ, গৃহবধূ, অবিবাহিত গৃহস্থ মেয়েদের অবদমিত যৌনবাসনার সুযোগ নিয়ে তাদের যৌন উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতেও ছাড়েনি তারা। এইসব মেয়েদের অনায়াসেই 'কুলটা' বলে চিহ্নিত করা হত এবং তাদের পক্ষে সংসারে টিকে থাকা অসম্ভব হওয়ার কুলত্যাগ করতে বাধ্য হত তারা। এদের অনেকেরই স্থান হত বেশ্যাপল্লিতে। বাংলার গণিকাজগতের রাজধানী কলকাতায় গণিকাদের সংখ্যা ১৮৫৩ সালে ছিল ১২,৪১৯। ১৮৬৭-তে সংখ্যাটা গিয়ে দাঁড়ায় ৩০,০০০-এ। এই বেশ্যাদের অধিকাংশই এসেছিলেন হিন্দু উচ্চবর্ণ থেকে। সামাজিক কঠোর রীতিনীতি, পুরুষের প্রতারণার পাশাপাশি এই মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি করে যা কাজ করত তা হল আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং আত্মপরিচিতি খুঁজে পাবার আকাঙ্ক্ষা। এদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন কিছুটা স্বাধীনচেতা, পারিবারিক ও সামাজিক বিধিনিষেধে অনিচ্ছুক; অনেক ক্ষেত্রেই এঁরা স্বতোপ্রণোদিত হয়ে গৃহত্যাগ করতেন। দারিদ্র বা কৌলীন্য প্রথার মতো সামাজিক কারণ নয়, এদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রবণতাই ছিল চূড়ান্ত। সমসাময়িক পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে এদের সুখ, পরিতৃপ্তির কোনও স্বাভাবিক রাস্তা ছিল না বলে এরা গণিকালয়ে প্রবেশ করতে বাধ্য হতেন। ১৮৭২ সালে সরকারের নির্দেশে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশ ব্যাপী গণিকাবৃত্তিতে যোগ দিতে আসা মেয়েদের চরিত্র ও যোগদানের কারণ সম্পর্কে এক বিশদ রিপোর্ট পেশ করেন। বঙ্কিমের মতে এদের মধ্যে বেশ বড়োসংখ্যক মেয়ে আসছে Ennvi and love of excitement এর কারণে, অর্থাৎ একঘেয়ে জীবনযাপন-প্রসূত মানসিক অবসাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং তা থেকে বেরিয়ে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা আহরণের আকাঙ্ক্ষা। হিন্দু পরিবারের কঠোর নিয়মকানুন স্বাধীনচেতা বহির্গামী মেয়েদের পক্ষে অত্যন্ত আরোপিত যন্ত্রণার কারণ হত। বঙ্কিমের ভাষায় "women with vicious tendencies are therefore obliged to place themselves beyond its power...These women are therefore found to lead the prostitutes' life for want of a better one." কাজেই উনিশ শতকের গণিকাসংস্কৃতির অন্দরমহল এবং কুলবধূর বেশ্যায় পরিণত হবার আখ্যান যেসব টেক্সটে ছড়ানো আছে, সেগুলোকেও আজ অন্য চোখে পড়া দরকার। পুরুষের বয়ানকে উলটে নেওয়া প্রয়োজন। উলটো করে পড়া বয়ান থেকেই বেরিয়ে আসবে অন্ধকারের অন্যপিঠ। কেবল পুরুষের যৌন উপকরণ হওয়াই নয়, বাড়ির মেয়েরাও যে অতৃপ্ত কামনা চরিতার্থ করার হাজারো উপায় বের করছে—এটাই এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয়। সামাজিক হায়ারার্কি যখন পুরুষের যৌন স্বেচ্ছাচার সম্পর্কে সহনশীল হওয়া সত্ত্বেও মেয়েদের যৌন অতৃপ্তি সম্পর্কে উদাসীন থেকেছে, তখন, হাজারো লোকলজ্জা, সমাজচ্যুত হবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও মেয়েদের নিজস্ব যৌন পরিতৃপ্তির এই চেষ্টাকে পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত যৌননৈতিকতার সাজানো কাঠামোয় এক ধরনের অন্তর্ঘাত হিসেবে পড়া যেতেই পারে। তারকচন্দ্র চূড়ামণির *'সপত্নী নাটক'*-এ স্বামীসঙ্গবঞ্চিতা কুলীন কন্যা নিতম্বিনী তার অতৃপ্ত দেহমনের বাসনা প্রকাশ করলে বোন চঞ্চলা বড়দি কাদম্বিনীকে বলে ওঠে :

> দিদি, শুনলি নিতু যেন এককালে ক্ষেপে উঠলো মা, ওর আগুন জ্বলে উঠেছে, ও আর থাকতে পারে না, ও মা। চেনা দায়।

এই নাটকেই মা হরমণি তার মেয়ে হরিপ্রিয়াকে শোনাচ্ছে নিজের গুপ্ত জীবনের বৃত্তান্ত। কুলগুরুর সঙ্গে রাতের পর রাত ধর্মাচরণের অছিলায় হরমণি তার অতৃপ্ত দৈহিক বাসনা পূরণ করত। সে বলেছে :

> তাঁর (গুরুর) মুখের পানে চেয়ে কত শাস্তরের কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনি এত কি ঢলয়ে থাকি? কর্ব্বো কি বল?...আমরাও
তো সব হল্যেম কুলীনের মাগ, স্বামী কেমন সামিগ্রী,
কাল কি ধল ভাল করে চক্ষেও দেখিনি। আমরা কি আর
পোঁদে কাপড় দিই না গা? না কাল কাটাই না?

হরিমোহন কর্ম্মকার রচিত '*মাগসর্বস্ব*' নাটকে পামর কোম্পানির ক্যাশিয়ার গণিকাসক্ত পুরুষদের উদ্দেশে বলেছে : "আরে ব্যাটারা, তোরা রাঁঢ়ের বাড়িতে লোচ্চামি করতে যাস, সমস্ত রাত কাটিয়ে আসিস, বাড়িতে তোদের মাগকে ঠাণ্ডা করে কে? তারাও তো লোচ্চা খুঁজে বেড়ায়।" 'জন্মভূমি' পত্রিকার মাঘ ১৮৯৬ সংখ্যায় প্রকাশিত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-র 'তপস্বিনী' গল্পে বালবিধবা শ্যামা পূর্ণযৌবনে পৌঁছে অন্যের মুখে অশ্লীল গল্প শুনে ও অশালীন যৌন আলোচনার মাধ্যমে নিজের অবদমিত বাসনা পূরণ করত :

গোপনীয় কথা বলিতে শ্যামা সকলের সেরা হইয়া
উঠিয়াছিল। যে সব গান অতি কদর্য্য, যে সকল গল্প
নিতান্ত অশ্রাব্য, সেই সকল গান ও গল্প বয়স্যদিগের
নিকটে করিত। ইহা ভিন্ন অন্য কিছু আমোদ সে জানিত না।

রামনারায়ণ তর্করত্নের লেখা 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকে বিবাহব্যবসায়ী কুলীন ব্রাহ্মণ অধর্মরুচি মুখোপাধ্যায় পুরোহিত ধর্মশীলকে বলেছে সে তার সবকটি বউকে সর্বদা সঙ্গদান করতে পারে না। ফলত, তার বিবাহিতা স্বামীবঞ্চিতা কুলীন বধূরা প্রায়ই অন্য পুরুষের সন্তান গর্ভে ধারণ করে। লোকনিন্দার ভয় এড়াতে তখন শ্বশুরবাড়ি থেকে টাকা খাইয়ে অধর্মরুচির মুখ বন্ধ করা হয় :

অধর্ম। আমরা কুলীনের ছেলে, অনেকগুলো বে, সর্বত্র ত যাওয়া হয় না, তা যদি কোথাও বিঁধে যায়, আর নিকাশ প্রকাশ
করা হয় না—বুঝতে পেরেছেন কি?
ধর্ম। হাঁ বুঝিছি। তবে কি হয়?
অধর্ম। তবে তারা লোকনিন্দে ভয়ে এসে আমাদের নে যাওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেষ্টা করে, আমাদেরও ঝোপ বুঝে কোপ, মটকা মেরে
বসে থাকি। সুতরাং তারা ১০/২০/৩০ টাকা দিয়া লইয়ে যায়।

উনিশ শতকীয় প্রহসন-নকশায় উল্লিখিত এইসব যৌন ব্যভিচারের ছবিকে শৃঙ্খলিত মেয়েদের উপর রক্ষণশীল পুরুষতান্ত্রিক নিপীড়নের কাহিনি হিসেবে কেবল না পড়ে যৌন অবরোধের বিরুদ্ধে গৃহস্থ মেয়েদের অবদমিত শরীরের বিদ্রোহ হিসেবেও পড়া যেতে পারে। মেয়েরাও স্বেচ্ছায় অংশ নিচ্ছে ওই শরীরী রেমাঞ্চে। এক্ষেত্রে তিনটি আখ্যানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে মেয়েরা স্বেচ্ছায় বিবাহিত-বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে এমনকী শেষ অবদি পরিবারের বাইরেও বেরিয়ে এসে গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করেছে। এই তিনটি আখ্যান হল ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা *'দূতীবিলাস'* (১৮২৫) এবং *'নববিবিবিলাস'* (১৮৩১) আর ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা *'আপনার মুখ আপুনি দেখ'* (১৮৬৩)।

উপনিবেশিক কলকাতায় সম্পন্ন পরিবারাগুলোতে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক এবং পিতৃতান্ত্রিক/পুরুষতান্ত্রিক যৌন অবরোধের ভিতর গৃহস্থ মেয়েদের নিজস্ব শারীরিক উপভোগ বা 'প্লেজার'-এর ছবি পাওয়া যায় 'দূতীবিলাসে'। মালিনীর সহায়তায় অনঙ্গমঞ্জরী পরপুরুষ শ্রীদেবের সঙ্গে এক গোপন কামসম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। এই গোপন মিলনে সহায়তা করত অনঙ্গের দাসী গোপী এবং এক দূরসম্পর্কের পিসি। বিভিন্ন কৌশলে বাড়ির বাইরে শ্রীদেবের সঙ্গে মোট ছবার মিলিত হয়েছে অনঙ্গমঞ্জরী। পিসিকে দেখতে যাবার নাম করে, বৈষ্ণবদের আখড়ায়, কালীঘাটে ঘরভাড়া নিয়ে, তারকেশ্বরে মিলিত হয়েছে তারা। কাহিনির শেষে পিসি কৌশলে অনঙ্গর স্বামীকে রাজি করিয়েছে নিঃসন্তান স্ত্রীর গর্ভে পরপুরুষের সন্তান ধারণ করানোয়, কারণ বংশরক্ষার জন্যই একাজ করা একান্ত প্রয়োজন। এই সুযোগে লম্পট শ্রীদেবও অনঙ্গ মঞ্জরীর গৃহে অনুপ্রবেশের সুযোগ পেয়ে যায় এবং অবাধে "কখনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রজনী যোগে কখনো দিবসে। / প্রত্যহ আইসে যায় অনঙ্গের বশে"। ক্রমে শ্রীদেবের ঔরসে অনঙ্গমঞ্জরীর গর্ভে তিন পুত্র হয়, তাদের প্রত্যেকের এবং অনঙ্গের ব্যয়ভার বহন করে নিঃস্ব হয়ে পড়ে শ্রীদেব। পরিবারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত স্বামীপুত্রবতী অনঙ্গমঞ্জরী শ্রীদেবের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে। হতাশ, ব্যর্থ, শ্রীদেবের কাতর আক্ষেপোক্তির মধ্য দিয়ে কাহিনি শেষ হয়।

'দূতীবিলাসের' সবচেয়ে বড়ো লক্ষণীয় দিক এর নায়িকা নিজের যৌনসিদ্ধান্ত নিজে নিয়েছে, পুরুষের ইচ্ছানুযায়ী নিজের উপভোগকে সীমাবদ্ধ রাখেনি। পঞ্চম মিলনে 'খেলাচ্ছলে বিপরীত শৃঙ্গারে' অনঙ্গ মঞ্জরী নিজে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে যৌনক্রীড়ায় :

লাজ বাদ সাধে আসি আঁখি ভরে।
কামদেব আরো মনে ব্যস্ত করে।।
ঘন কেশে আরো অতি ঘোর শশী।
উভয়েরই তাহা ঢাকে মুখশশী।।
কটিদেশ তুলে ঘন শব্দ করে।
জলবিন্দু তাতে তবু নাহি সরে।।
অবলা হইয়া সবলারি মত।
বহু কষ্ট পেলে নারী পারে কত।।
বিধিমতে কামে কত বজ্র মারে।
পরে বারি ঢালে মুষলের ধারে।।

আর, এটাও লক্ষণীয়, শ্রীদেবের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক বজায় রেখেও অনঙ্গমঞ্জরী কিন্তু নিয়মিত স্বামীর সঙ্গে শারীরিক মিলন চালিয়ে গেছে। অর্থাৎ বাধ্য হয়ে নয়, সে যা করেছে অত্যন্ত সচেতনভাবেই করেছে; অন্তরে শ্রীদেবকে ধারণ করেই সে পতির সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

রঙ্গভঙ্গ দেখি তার পতি গেল ভুলিয়া।
পালঙ্কেতে শুলো গিয়ে নিল বুকে তুলিয়া।।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রসে বসে রাত্রিশেষে নিদ্রা যায় হইয়া।
অনঙ্গের নাহি নিদ্রা শ্রীদেবেরে ভাবিয়া।।

'নববিবিবিলাসে'র শুরুতেই ভবানীচরণ জানাচ্ছেন বাবুদের বারাঙ্গনাসঙ্গ এবং স্ত্রীর প্রতি অমনোযোগের কারণেই কুলবধূরা অতৃপ্ত দেহমনের আকাঙ্ক্ষা মেটাবার তাগিদে অন্য পুরুষ খুঁজে নিত। স্বেচ্ছায় কুলত্যাগ করার মধ্য দিয়ে পারিবারিক হায়ারার্কি ভেঙে ফেলে শরীর ও মনের বন্ধনমুক্তির আকাঙ্ক্ষাই সর্বপ্রধান অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে : "এমত কোন কোন কামিনী স্বামীর জ্বালায় জ্বলিতাঙ্গ হইয়া, কেহ বা অন্য কোন বিষয়ের আশয়ে ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া, কেহ বা সুখেচ্ছায় নির্ভর করিয়া-সচ্ছন্দ পরমানন্দে পুরুষের ইচ্ছামত আহারবিহার পূর্বক যথেচ্ছাচার করিতে পারে এবং বাবুগণেও ধনদানে সকল ধনীকে বশ করেন।...এই ক্ষণিক কাল্পনিক সুখে সুখ জ্ঞান করিয়া কুলে কালি দিয়া কুলের বাহির হয়েন।" পরিবার এবং অনড় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নববিবি নাপিতিনীকে বলে "দেখ স্বামীর এই দশা, তাহাতে আবার যদি গোপনে এদিক ওদিক কোনদিক চাই...বাটীর রস্যুয়া, ব্রাহ্মণ কিম্বা জলতোলা ভারী অথবা কুটুম্ব লোকজন কাহারো সঙ্গে কালে ভদ্রে পিত্তরক্ষার নিমিত্ত আলাপ করিলে অভাগা মাগীগুলা কতই কয়, এত কি প্রাণে সয়, যেমন পাপিষ্ঠ ভাতার তেমনই তার আর ভাত খাইব না এবং গুরুজনেও যে প্রকার ভর্ৎসনা করে তেমনই তাহাদিগকেও আক্কেল দিব"...নববিবি এরপর পুরোপুরি বেশ্যায় পরিণত হয়। তাকে বিবিধপ্রকার গানবাজনা ও নাচের তালিম দেবার বিশ্বাস্য বর্ণনা দেন লেখক। এই তালিমের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ বৃদ্ধ বেশ্যা কর্তৃক নতুন ব্যবসায় নামা নববিবিকে 'কসবের রীতিনীতির' শিক্ষা দেওয়া। "তুমি কুলবধূ ছিলে...এক্ষণে নহে, যেহেতুক এক্ষণে তুমি বেশ্যা হইয়াছ, অতএব বেশ্যারদিগের আচার করিতে হইবেক।" অতঃপর উন্মুক্ত যৌনক্রিয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে নববিবিকে যৌনশিক্ষা দেওয়া হল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"দিনসেই সাবকাশক্রমে নবাবিবিকে বিবিধ বন্ধানে সকল বন্ধ দেখাইলেন, তাহাতে নবাবিবি চতুঃষষ্টি প্রকার বিহারবিদ্যায় বিলক্ষণ বিচক্ষণা হইলেন।"

এর প্রায় তিন দশক বাদে বেরোয় ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের *'আপনার মুখ আপুনি দেখ'*। এখানেও পারিবারিক অবরোধ ভেঙে কুলবধূরা বেরিয়ে এসে গণিকাবৃত্তি গ্রহণ করেছে। পুরোহিত দাদাঠাকুরকে বাবুর ইয়ারবক্‌সিরা জিগেস করেছে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসতে ইচ্ছুক কোনও কুলবধূর সন্ধান আছে কিনা :

—এখন বল দেখি চারে মাচ্ টাচ্ আছে কিনা?
—তা অনেক দেখতে পাওয়া যায় এক ২ জায়গায়
তিন চারটে মাচ একসঙ্গে ঘাই দিচ্ছে...
—থাকে কোথা এবং রকম কেমন এবং কি কোল্লে
টোপ ধোরতে পারে?
—মহাশয়! রকম খুব ভাল, এদিকে আমাদেরই বটে,
তাতে কোন দিকে অরুচি হবে না...আর টোপ ধরবার
কথা যে বোললেন, আপুনি কি ভাজা মাচ উল্টে খেতে
জানেন না? বিদ্যাসুন্দর বইখানি তো পোড়েছেন, স্মরণ
করে দেখুন দেখি কিসে বাঘের দুদ্ মিলে?

এরপর গৃহস্থ বাড়িতে গিয়ে টাকার বিনিময়ে মেয়েদের বের করে আনার উদ্যোগ নেয় দাদাঠাকুর। আরও বড়ো কথা, এই মেয়েরা নিজেরাই বেরিয়ে আসতে উৎসুক, তাদেরই একজন নিজের অবদমিত আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে ফেলেছে দাদাঠাকুরের সামনে :

খুড়ীমা আমাদের স্বভাব দেখে সর্বদাই চোখে ২ রাখেন
রাত্রে পাশ ফিল্লে হাত দে দেখেন...দাদাঠাকুর। তোমার
সাক্ষাতে বোলতে কি? আমরা চারিজনাতে আজ কতদিন
পর্যন্ত পরামর্শ কোরেও কিছু কোরে উট্‌তে পাচ্ছিনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দজ্জাল খুড়িমাকে টাকার লোভ দেখাতেই তিনি রাজি হলেন এবং বাড়ির চারজন যুবতী মেয়েকেই বাবুর বাগানে পাঠাতে রাজি হলেন। এরপর নির্দিষ্ট রাতে নববিবিরা বাবুর সঙ্গে বাগানবাড়িতে যাবার জন্য বেরিয়ে এল—"নববিবিদের খুড়ীমাতা যে সময়ে বাবুর হাত ধোরে সততা জানাচ্ছেন, সেই সময়ে হবু বিবিরা কুলের মুখে ছাই দিয়া বাটীর বাইরে এলেন।" এরপর এই নববিবিরা পেশাদার গণিকায় পরিণত হয়। বাবুর বাগানের পার্টিতে নরক গুলজার চলছে। সেদিনের সেই গৃহস্থ বাড়ির মেয়েটিই আজ শহরের নামকরা বেশ্যা চন্দনবিলাসী। তাকে দেখতে শহরের বাবু সম্প্রদায় সহ অনাহুত জনেদেরও ভিড়। গার্হস্থ্য অবরোধ ভেঙে সেই সামান্য মেয়েটিই আজ প্রাকৃতজনের আকর্ষণের ভরকেন্দ্র :

আর ২ কত লোকে কত কথাই বোলচে, কেও বোলচে চন্নবিলাসী কেও কেভ বোলচে, ঐ যে চীনেপুত কাপড় পরা ঐ চন্নবিলাসী। কেহ বোলচে ও না, ঐ হাতে যার রতনচুর ঐ চন্নবিলাসী। কতগুলি লোকে এই রকম মিছে তর্ক কোচ্চে।

৩

কিন্তু যে মেয়েরা কুলের মুখে ছাই দিয়ে বেরিয়ে আসেনি, কেমন ছিল তাদের যৌনতা? গৃহের অবরোধের ভিতর কীভাবে শারীরিক চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটত তাদের? এ বিষয়ে মেয়েদের নিজস্ব স্পষ্ট উল্লেখ নগণ্য। পুরুষের লেখা থেকেই তার পরোক্ষ ইঙ্গিত কিছু কিছু মেলে। জনপরিসরে প্রচলিত অনেক অখ্যাত টেক্সটে এধরনের সামান্য উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন, নারায়ণ চট্টরাজ রচিত 'কলিকুতূহল' (১৮৫৮) বইতে কলিযুগের অধঃপতনের নিদর্শন বোঝাতে পরিবারের ভিতর অজাচারের (incest) বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এখানে দাদা বলপূর্বক নিজের বোনের শয্যায় উপগত :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

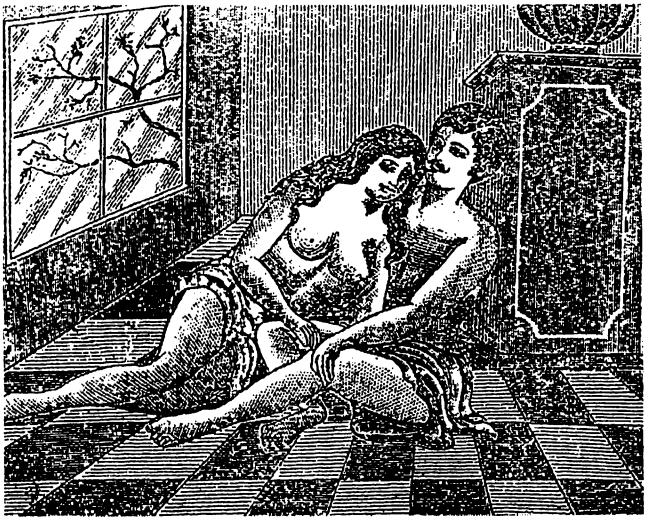

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মদনমন্দঅলসে প্রদোষে নিদ্রার রসে
শয়নে আছি বিরসে দাদার শয্যায় গো।
আছি গৃহ অন্ধকারে কেবা বল দেখে কারে
দাদা অবিজ্ঞাতসারে শুতিল তখনি গো।।
বধূভ্রমে দাদা মোরে চুম্বন করে অধরে।
ধৈর্য্য কি তেজিয়া ধরে অমনি ছুটিল গো।।

১৮৫৫ সালে প্রকাশিত কাব্য 'কামিনী গোপন ও যামিনী যাপন' বইতে পাওয়া এমন এক বর্ণনা যেখানে নায়িকা নিরুপমা শারীরিক ছলাকলায় উত্তেজিত করছে প্রেমিককে :

থম্‌কে থম্‌কে থম্‌কে ধনী।
তালে তালে নাচে চমকে মণি।।
কভু খুলে দেয় বুকের বাস।
প্রমদা পুরায় পতির আশ।।
সুখের নাচের কেমন ছটা।
নিতম্ব দোলনে কেমন ঘটা।।
যৌবনে বিশাল নিতম্বদ্বয়।
হেলিছে দুলিছে স্থির না রয়।।
পতি জানু মাঝে জঘন দিয়া।
সঘন নাড়িছে মদন প্রিয়া।।
প্রাণেশ প্রাণেতে প্রফুল্ল মনে।
কাঁপায় জঘন নিতম্ব সনে।।

অন্দরমহলের মেয়েদের যৌনসক্রিয়তা, মৈথুনে উদ্যোগী ভূমিকা এবং মেয়েদের সমকামী আচরণের বিবরণ সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় উনিশ শতকের কেচ্ছাপত্রিকা *'সম্বাদ রসরাজ'*-এ (১৮৪৯)। অধিকাংশই নাম গোপন করে বা ছদ্মনামের আড়ালে কলকাতার বিভিন্ন অভিজাত পরিবারের মেয়েদের যৌন আচরণের রসালো বিবরণ। যেমন নির্জন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুপুরে বাড়িতে আসা ফিরিওয়ালাকে সিডিউস করছে এক গৃহবধূ। ফিরিওয়ালার জবানিতেই শোনা যাক তার বৃত্তান্ত :

> ধনমনী আমাকে ডাকিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলেন। তিনি এখন যুবতী হইয়াছেন, দুটো মাই উঁচো হইয়া উঠিয়াছিল...আমরা ছোটলোক, বাঁ উরোতের কাপড় প্রায় তুলিয়াই রাখি। বসিতে কি প্রকারে কাপড় সরিয়া আমার সেইটি বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তাহার গড়ন কিছু লম্বা কচি ওলের কোঁঢ়ার মত, ধনমনী তাহার পানেই চাহিয়া রহিয়াছেন আমি আগে ইহা জানিতে পারি নাই...যখন জানিতে পারিলাম ঐদিগে তাহার চোখ পড়িয়াছে তখন আমারো গা শিউরে উঠিল, সুতরাং মেয়েমানুষ দেখিয়া পুরুষের গা শিউরিলে যা হয় তাহাই হইল আমি আর তাহাকে কাপড় ঢাকা দিলাম না, তাহার উদ্‌গম হইতে লাগিল...তখন আমি লজ্জার মাথা খাইয়া বলিলাম ঠাকুরানি তুমি উহার পানে চাহিয়া রহিয়াছিলে বুকের কাপড় ফেলিয়া দিয়াছ, ওকি বুঝিতে পারে না, প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে, তুমি বাঁচাও বাঁচে মারাও মরে...ধনী এই কথা শুনিয়া একটুকু হাসিয়া আমাকে ঘরের ভিতর লইয়া গেলেন এবং আমার কোমরে দুই পা তুলিয়া দিয়া তায়তায় লাগাইয়া কহিলেন দে, দে, দেরে, ফিরিওয়ালা দে...

অপর একটি সংখ্যায় "অল্প বয়সে পতিহীনা কোন কুলবালা অবলা" 'রসরাজ'-সম্পাদককে চিঠি লিখে জানাচ্ছে নিজের দাদার সঙ্গে তার শারীরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। অন্য একটি সংখ্যায় "শিমুলিয়ার মধ্যস্থিত কোন পাল মহাশয়ের পুত্র' এবং তার 'বিধবা বড়ো ভগিনী'-র কামলীলার বিস্তারিত বিবরণ ছাপা হয়েছে :

> ভগিনী অমনি বক্ষের কাপড় খুলিয়া কহিলেন ভাই, এই দেখ, সমুদয় বক্ষেতেই বেদনা হইয়াছে...ইহা শুনিবামাত্র ভ্রাতা শীঘ্রগতি ভগিনীর বক্ষমূলে হস্তপ্রদানপূর্বক মহামন্ত্র পাঠ করত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডলিয়া দিতে ২ তৎস্থানের উচ্চমাংসও মলিয়া দিতে লাগিলেন এবং ক্রমে ২হস্ত অধোগামী করিয়া তলপেট এবং নিতম্বের বসন খুলিয়া হস্ত অধোগামী করিয়া বুলাইতে ২ অনঙ্গে মোহিত হইয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে আলিঙ্গন দিলেন, এমতকালীন ভগিনী আলুথালু বেশে শিহরিয়া কহিলেন, যাদুমণি, ও কি, শীঘ্র ছেড়ে দেও, কে দেখিবে, কে শুনিবে...এখনি একটি গোল করিয়া তুলিবে...তখন ভ্রাতা কহিলেন যেখানে বিবর সেইস্থানেই ভুজঙ্গ , তুমি এই ত্রাস কর, কিছু ভয় নাই, একটু চুপ করিয়া থাক, আমি যে তুকতাক মন্ত্র জানি, কে কি করিতে পারে, সকলের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিব...এই কথা বলিয়া ভগিনীকে এমন আরাম করিতে লাগিলেন, ভগিনী কেবল আঃ আঃ শব্দ করিতে করিতে বিলক্ষণ আরোগ্যা হইলেন...

আবার বাড়ির চার দেওয়ালের কড়াকড়ির বাইরে, তীর্থদর্শন করতে গিয়ে কলকাতার বড়োবাড়ির মহিলারা নিজেদের মতো করে যৌনসুখ উপভোগ করছে, এমন বিবরণও পাওয়া যায়। "বল্লভপুরের দ্বাদশ গোপাল" দর্শন করতে গিয়ে কলকাতার কুলবধূরা এক সমবেত যৌনাচারে মেতে ওঠেন—"তাহারা সেই স্থানে যাইয়া বারোওয়ারী নারী হয়েন"। প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় :

কলিকাতা নগরের যেসকল স্ত্রীলোকেরা দুগ্ধফেনবৎশয্যায় শয়ন করেন তাহারাও সেই ঘরে মাদুরের উপর পড়িয়া গেলেন...যাহারদিগের বক্ষস্থলের গুটী উঠিয়াছে, তাঁহারাও যেমন, যাহারদিগের বক্ষস্থলে পাশের বালিশ ঝুলিয়াছে তাঁহারাও সেইরূপ মূল কর্ম্মে সকল সমান...পুরুষেরা ঘরে ঘরে করেন তথাচ মেয়েদের কুটকুটোনী বারণ করিতে পারেন না, এদিকে বাড়ীতে কড়াকড়ি চৌকী, ওদিকে মেয়েরা বাহিরে যাইয়া দুই চক্ষের ব্রত করে আমি তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমরা দ্বাদশ গোপাল দেখিতে আসিয়া এই প্রকার লম্বা গোপাল ঢুকাইতেছে ইহাতে কি তোমাদের কর্ত্তারা ক্রোধ করিবেন না, স্ত্রীলোকেরা কহিলেন আমরা ভয় করি না, সকল ঘরেতেই এ কাণ্ড আছে কোন্ বেটা কি বলিবে, আমাদিগের মান্য লোকেরাই সম্পর্ক বাছেন না...একজন প্রকাশ্য বৌও হইয়াছে আপনি শুনিয়াছেন, পরম ধার্ম্মিকবতার আর একজন শাশুড়ীর সঙ্গে ছিলেন...তবে আমরা কেন ছাড়িব...

'সম্বাদ রসরাজ' পত্রিকার সবচেয়ে সেনসেশনাল রিপোর্টাজ ছিল কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পর্কে কেচ্ছা। কারণ এই পত্রিকাগোষ্ঠীর লোকজন ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর বিপক্ষ গোষ্ঠীর। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বন্ধুবান্ধব সমভিব্যহারে পায়ুকামে লিপ্ত এই অভিযোগের পাশাপাশি তাঁর স্ত্রী বিন্দুবাসিনী, বন্ধু ক্ষেত্রমোহনের স্ত্রী মণিমঞ্জরীসহ পরিবারের অন্দরমহলের মেয়েদের যৌনতার বিস্তৃত ছবি এঁকেছেন। একটি সংখ্যায় বিন্দুবাসিনীর নিজের জবানিতে জানানো হয়েছে দেওরের সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্কের কথা। অপর একটি সংখ্যায় পাই মেয়েদের সমকামিতার উন্মুক্ত বর্ণনা। এখানে বিন্দুবাসিনী প্যাসিভ, সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে ক্ষেত্রমোহনের স্ত্রী মণিমঞ্জরী ও তার শাশুড়ি। বর্ণনায় স্ত্রীসমকাম বোঝাতে চলতি স্ল্যাং হিসেবে 'চাক্তিমৈথুন' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে :

ক্ষেত্রের স্ত্রী মণিমঞ্জরী আসিয়া কহিল ও সৈ বিন্দু ওরা যদি পুরুষে পুরুষে করিতে করাইতে পারে তবে কি আমরা মেয়ের ২ পারিনা, চল আমরা চাক্তিমৈথুন করি...বিন্দুবাসিনী যদিও দেবরগামিনী বা বহুপুরুষ বিলাসিনী হইয়াছে তথাপি চাক্তিমৈথুন জানে নাই, সে কহিল সখি মণিমুঞ্জরি, চাক্তিমৈথুন কেমন, তাহাতে কি মেয়েদের হয়, যুবতী বিন্দুবাসিনীর এই কথার আভাস পাইয়া ঘাগি কুটনী ধূমসী মাগি ক্ষেত্রের মাতা পুত্রবধূ মণিমঞ্জুরীকে পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রে আসিয়া বিন্দুর মুখচুম্বন করিয়া কহিল, প্রাণ বিধুমুখি, চাক্তিমৈথুন জান না, এইখানে শোও,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগে শিখাই, এই কথা বলিয়া মাগী বিন্দুকে কর্ম্মের মত ধরিয়া বসিল, মণিমঞ্জরী বলে শাশুড়ী কর কি, আমি আগে করিব, মুক্তামনী, বিশ্বেশ্বরী, তারিনী প্রভৃতি সখীরাও যো পাইয়া উন্মত্তা হইয়া উঠিল...

যে উদাহরণটি দিয়ে মেয়েদের যৌনতার উপর এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ হবে সেটি নেওয়া হয়েছে পূর্বোক্ত নারায়ণ চট্টরাজ-এর লেখা *'কলিকৌতুক'* নাটক থেকে। সহজিয়া বৈষ্ণবদের আখড়ায় জনৈক আনকোরা তরুণ সন্ন্যাসীকে যৌনমিলনে প্রলুব্ধ করছেন এক অভিজ্ঞা বৈষ্ণবী। তরুণ বৈষ্ণব সখীচরণের জবানিতেই শোনা যাক সেই ঘটনা :

> একবার ওনাতে আমাতে উত্তরপ্রদেশ যেতে যেতে একদিন শিষ্যি বাড়িতে পৌঁছতে না পেরে পথের মাজে এক মুদিখানায় থাকলাম, রাত্রিতে উনিও যে ঘরে শুলেন আমিও সেই ঘরে শুলাম। ... (অতঃপর) মা গোঁসাই আমাকে বোল্লেন বাছা সখীচরণ। আমার চরণ দুটো আজ বড় দরজ কোচ্চে, তুই নাকি একটু তেল টেল দিতে পারিস? আমি বল্লাম পারব না কেন মা গোঁসাই। আচ্ছা দিচ্ছি। এই বোলে আমি তেলের বাঁশ থেকে তেল বের কোরে ওনার চরণতলে বোসে তেল দিতে লাগলাম। উনি বোল্লেন একটু ভাল করে টিপে টেপে ওপর তাকাৎ দিয়ে দে, আমি যেন চরণতলে বোসেই হাঁটু তাকাৎ টিপ্‌তে টাপ্‌তে লাগলাম, উনি বোল্লেন ও ভাল হচ্ছে না, একটু সরে এসে ভাল কোরে দে, আমি আর একটু সোরে নে হাঁটুর একটু ওপর তাকাৎ যেন তেল দিতে আরম্ভ কোরলাম। উনি বোল্লেন আ মর বেটা! ও যে হোলো না, তুই আর একটু সরে আয় না, আমি তোর দাবনার ওপর পা দিই, তুই ভাল কোরে দাবনার ওপর তাকাৎ টিপেটেপে দে, কি কোরবো আবার আমি তাই কোরতে লাগলাম, তখন উনি বোল্লেন সখীচরণ তুই বৃন্দাবন দেখেছিস? তাতেই আমি বোল্লাম কোই না! মা গোঁসাই বোল্লেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু ওপর পানে হাত দে দেখ্ না, ঐখানে গুপ্তবৃন্দাবন আছে। বাবাজি। আমি তখন এতো তো বড়ো জানিনে শুনিনে। আমাকে বোল্‌লেন আমি তাই কোরলাম, উনি বোল্লেন দেখলি, আমি বোল্লাম দেখলাম মা গোঁসাই দেখলাম। তাতেই আবার উনি বোল্লেন দেখলি তো পরিক্রমা কর। আমি বোল্লাম মা গোঁসাই পরিক্রমা কেমন কোরে করে তাতো আমি জানি না, উনি বোল্লেন রোক্ তবে আমি দেখাই, এই বোলে উঠে, বলেন সনাতন কোই। তা নৈলে কি পরিক্রমা হয়? আমি বলি তা তো জানি না, উনি বোল্লেন থাক আমি জানাচ্ছি এই বোলে আমার সনাতনের সঙ্গে বৃন্দাবনের পরিক্রমা কোরতে লাগলেন...

বলাই বাহুল্য 'সনাতন' এখানে 'পুরুষাঙ্গ' এবং 'গুপ্তবৃন্দাবন' এখানে 'স্ত্রী-যোনি'র সাংকেতিক নাম। ফিকশনাল রচনা হলেও এই লেখা থেকেই বোঝা যায় পুরুষ আধিপত্যের নিগড় ভেঙে মেয়েদের নিজস্ব যৌনতার পরিসর যে উনিশ শতকের বাঙালি জীবনে বজায় ছিল, তা নিশ্চিত। সেই যৌনতার খুঁটিনাটি আজ আমাদের আগ্রহ এবং অনুসন্ধানের বিষয় হতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উনিশ শতক : বাঙালি মেয়ের পোশাক-ভাবনা

২০-২২ বছর আগের ঘটনা। সালটা বোধহয় ১৯৯৫। কলকাতার আশুতোষ কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ তাঁর কলেজের ছাত্রীদের জন্য সুনির্দিষ্ট পোশাক-বিধি সংক্রান্ত ফতোয়া জারি করেন। সম্ভবত, তাঁর দাবি ছিল, ছাত্রীদের শাড়ি পরেই কলেজে আসতে হবে। সালোয়ার বা জিন্‌স নিষিদ্ধ। সেসময় টিভি চ্যানেলের এতো রমরমা হয়নি। তবু খবরকাগজের পাতায় অধ্যক্ষ মহাশয়ের চাপিয়ে দেওয়া পোশাকবিধি নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে অনেক চাপানউতোর চলেছিল। এর এক দশক পরে, দক্ষিণ ২৪ পরগণার একটি স্কুলের জনৈকা তরুণী শিক্ষিকা সালোয়ার কামিজ পরে হাজিরা দেওয়ায় পরিচালন সমিতি এবং স্থানীয় অভিভাবকেরা সেই শিক্ষিকাকে রীতিমতো হেনস্থা শুরু করে। শিক্ষিকার যুক্তি ছিল, ভিড় ট্রেনে যাতায়াত করতে হয় তাঁকে। শাড়ির তুলনায় সালোয়ার কামিজেই তিনি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। সেসময় কলকাতার আশেপাশে একাধিক স্কুলেই মহিলা শিক্ষকদের পোশাক নিয়ে এধরনের সমস্যা তৈরি হয়। বিতর্ক দানা বেঁধে ওঠে এবং তৎকালীন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হস্তক্ষেপ করেন। শিক্ষিকারা যাতে নিজেদের সুবিধেমতো 'শালীন' পোশাকে স্বাধীনভাবে স্কুলে আসতে পারেন, সেই বিষয়টি নিয়ে তিনি প্রশাসনিক এবং দলীয় স্তরে উদ্যোগ নেন। আবার এই কিছুদিন আগেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনৈক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী যাদবপুর-প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের পোশাক-আশাক নিয়ে রীতিমতো আক্রমণাত্মক মন্তব্য করে বিতর্কের কেন্দ্রে এসেছেন। দেখা যাচ্ছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েদের পোশাক নিয়ে এই তর্ক-বিতর্কের পরিসরটি আজ, এই একুশ শতকে এসেও যথেষ্ট ইন-থিং, চর্চিত হয়ে রয়েছে।

এই বিতর্কের পরিসরটি খুঁটিয়ে অনুধাবন করলে, দুটি মূল জায়গা বেরিয়ে আসে। প্রথমত, পোশাক বিধি সংক্রান্ত বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেয়েরা। মেয়েদের পোশাক কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়ে পুরুষ-নারী নির্বিশেষে সামাজিক অভিভাবকরা নিরন্তর মন্তব্য করে যান। দ্বিতীয়ত, এই বিতর্কে তাঁরা বারবার বাঙালির 'ঐতিহ্য' নামক একটি কাল্পনিক সংরূপের কথা বলেন যে 'ঐতিহ্য' থেকে বিচ্যুত হবার ফলে একধরনের স্থায়ী উৎকণ্ঠার বোধ তাঁদের আপত্তিকে আরও বেশি ঘনীভূত করে তোলে। তাই বাঙালির পোশাক-সংক্রান্ত যেকোনও বিতর্কে অংশ নিতে হলে এই দুটি মূল প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতেই হবে। কেন পোশাক-সংক্রান্ত মতামত বা চর্চার মুখ্য আলোচ্য বা লক্ষ্যবস্তু প্রথমত এবং প্রধানত মেয়েরা? এবং, কেনই বা কোনও এক 'ঐতিহ্য' থেকে বিচ্যুত হবার যন্ত্রণা বা ভয় সবক্ষেত্রেই তাঁদের তাড়া করে ফেরে? প্রথমটির উত্তর সহজবোধ্য। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যেকোনও সামাজিক মতামতই 'লিঙ্গায়িত' বা 'জেন্ডারড'। সুতরাং 'শালীন'/'অশালীন' পোশাকের দায়ভার মেয়েদের উপরেই বেশিরভাগটা পড়বে সেটাই স্বাভাবিক। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর খানিকটা জটিল। যাকে 'ঐতিহ্য' বা হেরিটেজ' বলে ভাবি, তা আসলে ঐতিহাসিকভাবে নির্মিত এক একটি 'ডিসকোর্স' বা 'বয়ান'। 'মিথোলজিস' বইতে রোঁলা বার্ত যাকে বলেছিলেন "A decorative display of what goes without saying, which is undoubtedly by determined by history", অর্থাৎ ইতিহাসগতভাবে গড়ে ওঠে এমন একধরনের চলতি মতাদর্শ, যা অনেক ক্ষেত্রেই ততটা সচেতনতা ছাড়াই আমরা বহন করি, তার উৎস এবং কার্যকারণ না জেনেই।

তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, মেয়েদের পোশাক সংক্রান্ত অস্বস্তি এবং বিতর্কের উৎস আমাদের 'আধুনিক' হয়ে ওঠার ইতিহাসের ভিতরেই লুকিয়ে রয়েছে। অর্থাৎ উনিশ শতকেই এই বিতর্কের সূচনা এবং বিস্তার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেদিন যা হয়ে উঠেছিল প্রাধান্যবাদী কণ্ঠস্বর বা 'হেজিমনিক ডিসকোর্স', তাই বাঙালির প্রায় দুই শতাব্দী পেরিয়ে আসা ইতিহাসে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় আজও প্রবহমান। বিশেষত মধ্য-উনিশ শতক থেকে যে নারীকেন্দ্রিক আলোচনার সূচনা, যে মতাদর্শগত লেখাপত্রের মধ্য দিয়ে 'আধুনিক' বাঙালি নারীর কাম্য ছাঁচটি সেদিন মান্যতা পাচ্ছিল বাংলার শিক্ষিত নাগরিক সমাজে, সেই মান্য ছাঁচটি গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াকে অনুধাবন করলেই মেয়েদের পোশাক-বিতর্কের পরিক্রমাটি ধরা পড়বে।

২

উনিশ শতককে বলা যায় পাশ্চাত্য-প্রভাবিত দেশীয় 'ভদ্রলোক' শ্রেণির চেতনায় 'সমাজসংস্কার'-এ ব্রতী হবার যুগ। যে নতুন শ্রেণিটি সংগঠিত হচ্ছিল, ব্রিটিশের সহায়তায়, অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে, তারা খুব দ্রুত, চলতে থাকা প্রাক্-ঔপনিবেশিক ধ্যান-ধারণা, অভ্যাস, রীতিনীতি থেকে নিজেদের, আলাদা হিসেবে দেখতে চাইল। এটাই 'আধুনিকতা'। এই আধুনিকতার ছোঁয়ায় প্রাত্যহিক জীবনযাপন, নারী-পুরুষের সম্পর্ক, দাম্পত্য, যৌনতার মান্য রূপ, পরিবার, শিশু পরিচর্যা, আত্মপরিচয় ইত্যাদি বিষয়ে যে নিত্যনতুন ধ্যানধারণার জন্ম হতে লাগল, তার প্রকাশ ঘটল 'পাবলিক' পরিসরে। প্রকাশিত হল অসংখ্য বই, প্রবন্ধ, পোলেমিক্যাল রচনা, গড়ে উঠল এক বিপুল আর্কাইভ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এইসব রচনার বেশিরভাগেরই কেন্দ্রবিন্দু এবং অভিমুখ হল মেয়েরা, বিশেষত পরিবারে মেয়েদের অবক্ষয় এবং অধঃপতনের কথা কল্পনা করা হয়েছে, যেখান থেকে সমাজের গতিকে ঊর্ধ্বমুখী করে তোলাই যেকোনো সামাজিক প্রোজেক্টের উদ্দেশ্য। এবং এক কাম্য, উন্নত, আধুনিক স্যানিটাইজ্‌ড বাঙালি সমাজের পরিকল্পনা সফল হতে পারে সমাজে মেয়েদের যদি সেই 'আধুনিকতা'র প্রকল্পের ভিতর খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়। কারণ সেগুলোই নতুন যুগের উপযোগী 'ভদ্রমহিলা' হয়ে ওঠার স্বাভাবিক শর্ত। মেয়েদের পোশাক সেই 'প্রাগাধুনিকতা' থেকে আধুনিক হয়ে ওঠার একটি প্রধানতম শর্তে পরিণত হল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উনিশ শতকে বাঙালির 'আধুনিক' হয়ে ওঠার নেপথ্য অনুঘটক ইউরোপ। অথচ আমাদের 'আধুনিকতা' ইউরোপের হুবহু অনুকরণ হতে চায়নি কোনওদিনই। বরং ইউরোপকে আত্মস্থ করেও কীভাবে, দেশীয় নিজস্বতাকে বজায় রেখেই 'আধুনিকতা'র নিজস্ব স্থানাঙ্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন আমাদের উনিশ শতকীয় বুদ্ধিজীবীরা, সেযুগের অসংখ্য লেখা থেকেই তা স্পষ্ট হয়। দীর্ঘদিন মুসলিম রাজত্বের অধীনে থাকার পরে, ব্রিটিশ সংস্কারে আচ্ছন্ন হবার পরেও যে আমাদের কোনও নিজস্ব 'জাতীয়' পোশাকবিধি গড়ে ওঠেনি, সে সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রাজনারায়ণ বসু :

> প্রত্যেক জাতিরই একটি নির্দিষ্ট পরিচ্ছদ আছে। সেইরূপ পরিচ্ছদ সেই জাতীয় সকল ব্যক্তিই পরিধান করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদিগের বাঙালী জাতির একটি নির্দিষ্ট পরিচ্ছদ নাই। কোনো মজলিসে যাউন, একশত প্রকার পরিচ্ছদ দেখিবেন, পরিচ্ছদের কিছুমাত্র সমতা নাই। ইহাতে এক একবার বোধ হয়, আমাদিগের কিছুমাত্র জাতিত্ব নাই।
>
> [*সেকাল আর একাল*, ১৮৭৪]

পোশাকের অভিন্নতার সঙ্গে জাতিত্বের বোধকে মিলিয়ে দেওয়া থেকেই প্রমাণ হয়, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গড়ে উঠতে থাকা কাল্পনিক জাতিরাষ্ট্র-সংক্রান্ত প্রকল্পটি রাজনারায়ণের মনেও কাজ করছিল এবং সেখানে অভিন্ন পোশাকবিধিকে তিনি 'আধুনিক' জাতি হয়ে ওঠার উপকরণ মনে করেছেন। এর এক দশক পর ১৮৮৫ সালে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লেখেন 'বিলাতের পত্র' বইটি। এর একটি নিবন্ধ 'বাঙালীর পোশাক':

> বাঙালীর পোশাক অতি আদিম ও আদমিক (Adamitc)। বাঙালীর কোনো পোশাক নাই বলিলেও চলে। যদি জাতি, গুটিকতক সভ্য শিক্ষিত যুবকে না হয়, যদি জাতির আচার ব্যবহার ভদ্রতা শিক্ষা কেবল জগতের পঞ্চমাংশের স্বীকৃত না হয়, যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অশিক্ষিত লক্ষ লক্ষ কৃষক ও ব্যবসায়ী জাতির মূল হয়, তাহা হইলে দুঃখের সহিত বলিতে হইবে, বাঙালীর কোনোই পোষাক নাই।

এখানে আক্ষেপ প্রকাশিত হয়েছে 'জাতি' হিসেবে আমাদের 'অসম্পূর্ণতা' নিয়ে। একইসঙ্গে 'জাতি' বলতে যে শ্রেণি অবস্থান নির্বিশেষে বৃহত্তর ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে বোঝায় সে সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন দ্বিজেন্দ্রলাল। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'কোট বা চাপকান' প্রবন্ধে (পরে 'সমাজ' হইতে অন্তর্ভুক্ত) ইংরেজি পোশাকে অভ্যস্ত সেদিনকার বাঙালির পুরুষের আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তিটি দেওয়া হয়েছে খানিকটা বিদ্রূপের ভঙ্গিতে:

পুরুষের উপযোগী জাতীয় পরিচ্ছদ তোমাদের আছে কোথায় যে আমরা পরিব? ইহাকেই বলে আঘাতের উপর অবমাননা। একে তো পরিবার বেলা ইচ্ছাসুখেই বিলতি কাপড় পরিলেন। তাহার পর বলিবার বেলায় সুর ধরিলেন যে, তোমাদের কোনো কাপড় ছিল না বলিয়াই আমাদিগকে এই বেশ ধরিতে হইয়াছে। আমরা পরের কাপড় পরিয়াছি বটে, কিন্তু তোমাদের কোনো কাপড়ই নাই--সে আরও খারাপ।

স্টিফান গ্রিনব্লাট একেই বলেছিলেন 'রেনেসাঁস সেল্ফ ফ্যাশনিং' যা 'আধুনিকতা'র একটি অবশ্যম্ভাবী 'মরাল কোড'। এবং এই 'আধুনিকতা'র কারিগর এবং উদ্যোক্তা যেহেতু ঔপনিবেশিক সমাজের পুরুষ, তাই পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকেই 'ভদ্রমহিলার' উপযোগী পোশাক-সংক্রান্ত বিতর্কের সূচনা। সেক্ষেত্রে সমাজসংস্কারের অঙ্গ হিসেবে যেমন অন্দরমহলের মেয়েদের আধুনিক পোশাকে সাজিয়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হল, তেমনই মেয়েদের যৌনতাকে, বিশেষত যৌনশরীরকে নিয়ন্ত্রণ করার পুরুষতান্ত্রিক প্রকরণগুলোও কাজ করতে শুরু করল। এক্ষেত্রে শ্লীলতা অশ্লীলতা সংক্রান্ত বাইনারি ধারণাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। ভিক্টোরীয় রুচিবাগীশতায় যৌনতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেহেতু একধরনের ট্যাবু এবং নিষিদ্ধ এলাকাভুক্ত, তাই, ফুকো যাকে বলেছেন 'প্রাইভেটাইজেশন অফ সেক্সুয়ালিটি', অর্থাৎ শরীর-যৌনতা-পোশাক একটি প্রাইভেট পরিসর, অথচ তা হয়ে উঠছে পাবলিক বিতর্কের পরিসরভুক্ত। 'হিস্ট্রি অব সেক্সুয়ালিটি'র প্রথম খণ্ডে যাকে ফুকো বলেছেন "The object in short is to define the regime of power-knowledge-pleaseure that sustains the discourse on human sexuality"

৩

অন্তঃপুরের সংস্কারসাধনই মহিলাদের পোশাকবিধি পরিবর্তনের অন্যতম উদ্দেশ্যের একটি। যথার্থ 'আধুনিকতা'র স্থানাঙ্ক খুঁজে নেবার আগে কিররকম ছিল গৃহস্থ মেয়েদের পোশাক? রাসসুন্দরী দাসী তাঁর 'আমার জীবন' বইতে (১৮৭৬) লিখছেন :

> বিশেষতঃ তখন মেয়েছেলের এই প্রকার নিয়ম ছিল, যে বৌ হইবে, সে হাতখানেক ঘোমটা দিয়া ঘরের মধ্যে কাজ করিবে, আর কাহারও সঙ্গে কথা কহিবে না, তাহা হইলেই বড় ভালো বৌ হইল। সে কালে এখনকার মতো চিকন কাপড় ছিল না, মোটা মোটা কাপড় ছিল। আর যে সকল লোক ছিল, কাহারও সঙ্গেই কথা কহিতাম না। সে কাপড়ের মধ্য হইতে বাহিরে দৃষ্টি হইত না। যেন কলুর বলদের মতো দুইটি চক্ষু ঢাকা থাকিত। আপনার পায়ের পাতা ভিন্ন অন্য কোন দিকে দৃষ্টি হইত না। এই প্রকার সকল বিষয়ে বৌদিগের কর্মের রীতি ছিল। আমি ওই রীতিমতেই চলিতাম।

কিন্তু অন্দরমহলে আবদ্ধ, এই অসূর্য্যম্পশ্যা নারীকে অবরোধের বাইরে নিয়ে আসা, তার শিক্ষা, আলোকপ্রাপ্তি এবং তাকে আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের একক 'পরিবার'-এর মূল চালিকাশক্তি ও নেপথ্য কারিগর হিসেবে গড়ে তুলতে চাওয়াই ছিল উনিশ শতকের 'আধুনিকতা'র মূল প্রকল্প। তাই সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে, এরকম পদ্ধতির অনুসরণ জরুরি ছিল। অর্থাৎ আবদ্ধ 'ঘর' ও মুক্ত 'বাহির'-এর মধ্যবর্তী দেওয়াল কিছুটা হলেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেঙে যাক, অথচ নারীর আলোকায়ন যেন কোনোভাবেই পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত সমাজের চেনা 'থাকবন্দ' বা সীমানা অতিক্রম করতে না পারে সেদিকেও ছিল কঠোর নজরদারি। তবে সেদিনকার রিফর্মড মননে সবচেয়ে বেশি আপত্তিকর ঠেকেছিল মেয়েদের প্রচলিত পোশাক। বিশেষত অন্তঃপুরের মেয়েদের পোশাক যে শোভন ও শালীন নয়, সেবিষয়ে জনমত তৈরি হচ্ছিল আগে থেকেই। ১৮৩৫ সালের ১ আগস্ট 'সমাচার দর্পণ'-এ একটি চিঠি ছাপা হয়, প্রেরকের নাম হিসেবে লেখা হয় 'কস্যচিত বিদেশিন', মেয়েদের অন্তঃপুরের পোশাক সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করে বলা হয় : "এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকের পরিধেয় অতি সূক্ষ্ম এক বস্ত্রই সাধারণ ব্যবহার্য ইহা অনেক দোষাভাসের ও ভিন্নদেশীয় লোকেরও ঘৃণার্হ এবং নব্য ব্যবহারই অনুভব হয়।... যেহেতুক বর্তমান ব্যবহার অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম সর্ব্বাঙ্গাভাদর্শক বস্ত্রে স্ত্রীলোকের তাদৃশ সম্ভ্রম সম্ভবেনা, যদৃশ উত্তরীয় তদুপরি সর্ব্বগাত্রাচ্ছাদন বসনে হয়।" 'বামাবোধিনী' পত্রিকার ৮ বর্ষ ৮ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল : 'এদেশের স্ত্রীগণ যেরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করেন, এদেশে চলিত বলিয়া তাহাতে কেহ দোষ বোধ হয় না। কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে, ইহা কেবল উলঙ্গ অবস্থায় না থাকিয়া গায়ে একটি আবরণ দিয়া রাখা মাত্র।...ইহাতে...শীতবাতাদির ক্লেশ নিবারণ বা ভদ্রতা রক্ষা, পরিচ্ছদ ধারণের যে দুটি প্রধান প্রয়োজন তাহা কোনোরূপেই সম্পন্ন হয় না।" আসলে এদেশীয় মেয়েদের অন্তঃপুরের পোশাক প্রিমিটিভ, যথেষ্ট সভ্য নয়, এটি সমকালীন পোশাক সংক্রান্ত ডিসকোর্সের প্রধান প্রতিপাদ্য। 'বামাবোধিনী' পত্রিকার কার্ত্তিক ১২৭৫ সংখ্যায় একটি কবিতা বেরোয়। নাম : 'সূক্ষ্মবস্ত্র' :

সম্বোধিয়া গুরু কন প্রিয়তম বামাগণ
শুন আজি বসন বিষয়;
সংক্ষেপে কহিব তার দোষ গুণ ব্যবহার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিবা মন্দ কিসে ভালো হয়।
অতি সূক্ষ্ম পরিধেয় পরা অতি অবিধেয়
উভয়েরি পুরুষ রমণী,
ইউরোপ আমেরিকা এস্যা কিবা আমেরিকা
এ নিয়ম সমস্ত ধরণী...

শীত বাত নিবারণ সভ্যতার সম্পাদন
আর লজ্জা করা নিবারণ
এই কয় প্রয়োজন প্রধানতঃ সুসাধন
করিবারে বসন ধারণ।
আনুষঙ্গী শোভা তার নহে শোভা মূলাধার
বঙ্গে দেখি বিপরীত তার।
বসনে যা প্রয়োজন সব দিয়া বিসর্জন
শোভাকেই ভাবিয়াছে সার।
সূক্ষ্ম যে বসন যত তারি সমাদর তত
মোটা নামে সবে চটা হয়।
দেখি তন্ত্রবায়গণ সবে হয়ে সচেতন
সূক্ষ্মবস্ত্র কেনে অতিশয়।
দেখি দেখি বালাগণ এত সূক্ষ্ম যে বসন
করে কি সে অঙ্গ আবরণ?
বসনে উলঙ্গ হায়! সভ্যতা কি থাকে তায়?
নহে সে কি লজ্জার কারণ?

এরপর অন্তঃপুরের মেয়েরা ওই সূক্ষ্মবস্ত্রে বহির্জগতে পদার্পণ করলে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে, তার বিস্তারিত বর্ণনা। সবচেয়ে বড়ো বিপদ পুরুষের লোভী দৃষ্টিপাত, অর্থাৎ 'মেল গেজ'। 'অন্দর'/'বহিরের' বিভাজনটা আবার প্রকট হয়ে উঠছে এখানে :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গৃহে যবে অবস্থান সরু বস্ত্র পরিধান
করিলেও তত দূষ্য নয়;
কিন্তু যবে নিমন্ত্রণে কিংবা কোন্ প্রয়োজন
স্থানান্তর যাইবার হয়;
সরু বস্ত্র সেসময় কখনই যোগ্য নয়
নিশ্চয় দূষিত অতিশয়
কিন্তু পরিধান রীত ঠিক তার বিপরীত
দেখি হয় ক্ষোভের উদয়।...

অসৎ পুরুষগণ করি নারী দরশন
তাঁর দিকে এক দৃষ্টে রয়।
কভু মন্দ গান গায় সরমেতে মরে যায়
সাধু শীলা রমনী নিচায়।
কিন্তু কুলোকের মন কে করে আকর্ষণ
সূক্ষ্মবস্ত্র উত্তর তাহার;
হায়! কিন্তু বামাগণ ইহা অবগত নন
আকর্ষক চুম্বক লোহার!

এরপর বাইরের সমাজে বাঙালি ভদ্রমহিলার ঠিক কীরকম হওয়া পোশাক উচিত সে সম্পর্কেও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এখানে। যদিও ভদ্রমহিলার পোশাকবিধি সম্পর্কে, স্ট্যান্ডার্ড পরিধেয় পোশাক সম্পর্কে কী কী নির্দেশিকা সেদিন দেওয়া হচ্ছিল পত্রপত্রিকায়, সে বিষয়ে আরও বিস্তারিত বলব, আপাতত, পদ্যে সেই নির্দেশিকার ধরনটি দেখে নেওয়া যাক :

দেশীয় ভগিনীগণ শুন মম নিবেদন
কহিতেছি করিয়া বিষয়;
স্থানান্তর নিমন্ত্রণে কিংবা কোন প্রয়োজনে
এ বসনে যাওয়া যোগ্য নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেতে হলে কোন স্থান সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান
না হইল যদি সমুচিত;
কিরূপ বসন তবে নিন্দিত নাহিক হবে
হইতেছে এবে জিজ্ঞাসিত।
আছে এতে নানা মত অনেকের মতামত
বিদেশীয় সভ্যতানুগত;
কিন্তু যাহা বঙ্গ মাঝে সমাজে অনেক সাজে
সমধিক তাহাই সঙ্গত।
শুন গো ভগিনীগণ! করিতেছি নিবেদন
স্থানান্তর করিতে গমন,
হও কিছু সাবধান পট্টবস্ত্র পরিধান
করি সবে করিয়া যতন।
থাকিবে পিরান গায় দুষ্য না ভাবিও তায়
তাহে অঙ্গ করে আবরণ।।...

গাত্র আবরণ তরে পিরাণ পরিলে পরে
তাহে ধর্ম্ম হানি নাহি হয়,
নাহি অন্য কোন ক্ষতি নাহি দোষ এক রতি
শুদ্ধ গুণ জানিবে নিশ্চয়!

এই মতামতগুলির ভিতর দিয়ে সামাজিক ব্যবস্থার অন্দর বাহির বিভাজনটি বারবার পরিস্ফুট হচ্ছে। অর্থাৎ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত 'বাহির' আর নারীকেন্দ্রিক 'অন্দরমহল' এর চেনা বাইনারি আর কাজ করছে না। উপরে উল্লিখিত কবিতার যুক্তিক্রম আরও একটু বিস্তারিত ভাবে পাওয়া যায় 'বামাবোধিনী' পত্রিকার শ্রাবণ ১২৭৬ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় প্রকাশিত অজ্ঞাতনামা রচিত ''স্ত্রীলোকদিগের স্নান প্রণালী' প্রবন্ধে:

বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জঘণ্য আচারব্যবহারের অনেক পরিবর্তন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইয়া যায়। লোক যতই সভ্য হইতে থাকে সময়োচিত সভ্যতার অনুরূপ আচার ব্যবহারেও প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু অভ্যাসের এমনি প্রবল শক্তি যে লোকে অভ্যাসবশত অতি জঘন্য ব্যাপারকেও পোষণ করিয়া থাকে। এ দেশের স্ত্রীলোকদিগের স্নান প্রণালী ইহার মধ্যে একটি প্রধান জঘন্য ব্যাপার।

দেশীয় ভদ্র ও বিদ্বান ও সভ্য নামধারী ব্যক্তিরা কি করিয়া যে আজও পর্যন্ত ওই জঘণ্য প্রণালী পোষণ করেন বলিতে পারি না। অভ্যাসই ইহার মূল হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু এইরূপ জঘন্য ব্যাপারে তাঁহাদিগকে সতত দৃষ্টি না থাকিলে, স্ত্রীলোকদিগের উন্নতির পথে আপনারাই কন্টক হইয়া দাঁড়াইবেন।

দেশীয় অধিকাংশ লোক, বিশেষত পল্লিগ্রামবাসী কি ভদ্র কি সভ্য, কি জ্ঞানী, কি ইতর কি মূর্খ এ বিষয়ে কাহারও অবিদিত নাই। শহর বা তাহার নিকটবর্তী দুই একখান পল্লীতে ভদ্র বংশজ স্ত্রীলোকদিগের স্নানের এরূপ জঘন্য প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। পল্লীগ্রামবাসী কি ভদ্র, কি অভদ্র সকল স্ত্রীলোকই প্রকাশ্য জলাশয়ে পুরুষদিগের সহিত একত্র অবগাহন পূর্বক অকুণ্ঠিত হৃদয়ে স্নান করেন। এটি কম জঘন্য ব্যাপার নহে। স্নান করার মানে ইহা নহে, যে কেবল জলে একবার ডুব দিয়াই গৃহে প্রত্যাবর্তন করা। যদি কেবল ইহাই হইত, তাহাও কম জঘন্য ব্যাপার নহে। স্ত্রীলোকেরা লজ্জার মাথাটি খাইয়া পুরুষদিগের অপর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া অতি জঘন্য প্রণালী ক্রমে গাত্র মার্জন ও বস্ত্র ধৌতি করেন এটি দেখিয়া কোন্ ভদ্রলোক ইহার প্রতিবিধান না করিয়া থাকিতে পারেন। আবার তাঁহারা যে রূপ সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করেন তাহা পরিধান করিয়াও লোকসমাজে বাহির হইবারই যোগ্য নহে, যখন আবার সেই বস্ত্র জলে আর্দ্র হইয়া সকল গাত্রে আবৃত থাকে তখন বিবস্ত্রা ও বস্ত্র পরিধানে কিছুমাত্র প্রভেদ থাকে না। অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময় সাধুপুরুষেরা ওইরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া জলাশয় হইতে উঠিতে আপনাকে কুণ্ঠিত মনে করেন, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা অনায়াসে জলাশয় হইতে উঠিয়া আর্দ্র বসনে গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

দেশীয় ভদ্রলোকেরা আপন আপন স্ত্রী কন্যাদিগকে আবৃত পালকিতে গমনাগমন করা এবং অন্যের সহিত রেলের গাড়িতে গমনাগমন করা অবমাননা মনে করেন; তখনই তাহাদিগের সভ্যতা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু স্নানের সময় স্ত্রীলোকেরা প্রকাশ্য জলাশয়ে যে কি জঘন্য প্রণালীর অনুসরণ করেন তাহাতে একবারও মনোযোগ করেন না, তখন লজ্জারও ভয় থাকে না, সভ্যতারও ভয় থাকে না। এমন লজ্জাতেও ধিক এমন সভ্যতাতেও ধিক্।

ভদ্রবংশতজ স্ত্রীলোকেরাই বা কি প্রকারে প্রতিদিন এইরূপ জঘন্য কার্য করিতে থাকেন বলিতে পারি না। অভ্যাস! তোমার কেমন শক্তি তাহা কেহই বুঝিতে পারে না। যখন স্ত্রীলোকদিগের লজ্জার কিছুমাত্র আবশ্যকতা হয় না, যখন তাহারা ভ্রাতা, পিতা, স্বামী, শ্বশুর, দেবরের সম্মুখে আইসেন, তখনই তাহাদিগের লজ্জা আসিয়া উপস্থিত হয়। ধিক্ তাহাদের লজ্জার এমন লজ্জা থাকা ও না থাকা দুই সমান।...

এক্ষণে দেশীয় ভদ্র ও সভ্য মহাশয়দিগের প্রতি আমাদের বিনীত ভাবে নিবেদন এই যে, তাহারা যেন এরূপ জঘন্য প্রণালী পোষণে আর অনুরক্ত না হন। অনেক সময় হইয়াছে; এখন একটু স্থির চিত্তে ইহার অপকারিতা ও জঘন্যতার বিষয় চিন্তা করিয়া আপন আপন অবস্থানুরূপে স্নানের সদুপায় করিবেন।

উপসংহারকালে দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের প্রতি নিবেদন যে তাহারা নিজেরাও যেন এইরূপ জঘন্য ব্যাপারে আর প্রবৃত্ত না হন, যদি এক সপ্তাহকাল স্নান না হয় সেও বরং ভালো, রাত্রশেষে জলাশয়ে স্নান করিতে যাওয়া বরং ভালো, তথাপি পুরুষদিগের সম্মুখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাত্র মার্জ্জন ও পরিধেয় বস্ত্র ধৌতি করা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নহে। লজ্জার প্রকৃত ব্যবহার যে তোমার কতদিনে শিক্ষা করিবে তাহা আর বলিতে পারি না!!

লক্ষণীয়, ১৮৭০ দশকেই পত্রপত্রিকায় মেয়েদের পোশাক-সংক্রান্ত বির্তকে মেয়েরা নিজেরাই অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। তবে তাঁদের যুক্তিক্রম বহুলাংশেই পুরুষনিয়ন্ত্রিত যুক্তিক্রমের হুবহু প্রতিফলন। এবং এভাবেই এই আলোচনায় নৈতিকতা বনাম অনৈতিকতা, যৌনতা বনাম সামাজিকতা (এখানে 'সামাজিকতা' সম্পূর্ণভাবে ' যৌনতা' নামক অপকৃষ্ট ক্যাটেগরির বিপরীত), বিশেষত, 'সুসামাজিকতা' যে 'যৌনতা' নামক হীন রুচির বিপরীতে অবস্থান করে, এই ভাবনাই সমকালীন পরিসরে মিশেল ফুকো-কথিত 'প্রাইভেটাইজেশন অফ সেক্সুয়ালিটি'-র ডিসকোর্সকে মান্যতা নেয়। মনে পড়তে পারে, ফুকো যেভাবে স্টিফেন মারকুজ'-এর 'দ্য আদার ভিক্টোরিয়ানস'-এর ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে উনিশ শতকের ইউরোপে 'যৌনতার প্রাইভেটাইজেশন'-সংক্রান্ত পাবলিক এবং ডিসকার্সিভ প্রোজেক্টটিকে চিহ্নিত করেছেন, তার সঙ্গে উনিশ শতকের বাংলাতেও 'ভদ্রমহিলা'র যথার্থ 'নারীসত্তা'-র সঙ্গে পোশাকের সুনির্দিষ্ট ধারণাটিকে জড়িয়ে নেওয়ার প্রকল্পের সাযুজ্য পাওয়া যায়। নারীশরীরকে পোশাক দিয়ে আবরিত করার উপর এতোটা জোর দেবার মধ্য দিয়ে আসলে নারীর যৌনসত্তার বিশুদ্ধতা এবং গুরুত্বকেই সম্পূর্ণ বিতর্কের কেন্দ্রস্থলে নিয়ে আসার পরিকল্পনা কার্যকর হয়। যে পুরুষতান্ত্রিক এবং সচ্ছল দৃষ্টিকোণ থেকে, যে উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণি অভিমুখ থেকে মেয়েরা, সেদিন এই লেখাগুলি লিখছিলেন, তা ফুকো-কথিত ডিসকোর্স গড়ে ওঠার কণ্ঠস্বরের উৎসকে আরেকবার মনে পড়ায় :

to account for the fact that [sexuality in various names] is spoken about, to discover who does the speaking, the positions and viewpoints from which they speak, the institutions which prompt people to speak about it and which store and

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

distribute the things that are said, what is at issue, brefly, is the 'over-all discursive fact', the way in which sex is 'put into discourse'.

[*The History of Sexuality,* Volume I : An Introducton, Michel Foucault; trans. by R. Hurley, Vintage, 1980; P-11]

8

সামাজিক সংস্কারের অন্যতম এজেন্ডা হিসেবে নারীর পোশাক সংস্কারের পিছনে প্রধান অনুঘটক হিসেবে কাজ করছিল সমাজে অন্দরমহল-বর্হিমহলের ক্রমবর্ধমান সংযোগ, অর্থাৎ ভিতর-বাহিরের ভেদ ক্রমশ ঘুচতে থাকা, দূরত্ব কমে আসা। এক্ষেত্রেও অগ্রণী ছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার। অন্দরমহলের অসূর্যম্পশ্যা নারীদের লেখাপড়া শেখানোর সূত্রেই বাইরের পুরুষের পদার্পণ ঘটেছিল সেখানে। বৈষ্ণবী শিক্ষিকা, মেম শিক্ষিকার বদলে পারিবারিক সূত্রে পরিচিত পুরুষেরা কেবল পুথিগত বিদ্যাচর্চা নয়, সার্বিক জীবনবোধেও পরিবর্তন আনতে চাইলেন মেয়েদের জীবনে। স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর 'সেকেলে কথা'-য় লিখেছেন কীভাবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগে বাড়ির অন্দরমহলে বাইরের পুরুষের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল এবং সেই উপলক্ষেই শিক্ষিত, মার্জিত ভদ্রমহিলার পোশাক ঠিক কীরকম হতে পারে, সে সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ কতটা বিস্তারিত ভেবেছিলেন :

> আমাদের বাড়ির এই নবোন্নতিকালে কেশববাবু পিতামহের শিষ্য হইলেন। অসূর্য্যম্পশ্যা অন্তঃপুরে বাহিরের নিঃসম্পর্কীয় লোক এই প্রথম, অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের ন্যায় স্বাগত হইয়া প্রবেশলাভ করিলেন। অনেকে এই ঘটনাটিতে অসমসাহসিকতা প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হন। কিন্তু মহর্ষি পিতৃদেব, যিনি ধর্ম্মের জন্য আত্মীয় বান্ধব, সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্য অবাধে জলাঞ্জলি দিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তিনি যে সত্যধর্ম্ম গ্রহণাপরাধে গৃহতাড়িত, শিষ্যরূপে সমাগত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরণাগত সস্ত্রীক কেশববাবুকে দেশাচার তুচ্ছ করিয়া পুত্রস্নেহে গৃহে গ্রহণ করিবেন, ইহা কি বড়ই আশ্চর্য্যের কথা?

যদি আশ্চর্য হইতে হয়—তবে ইহার পরবর্তী আর একটি কার্য্যে। এতক্ষণ যাহা বলিলাম, এ সকলই মেজদাদা মহাশয় বিলাত যাইবার পূর্বেকার কথা। তাহার বিলাত গমনের দুই-তিন বৎসর পরে একজন অনাত্মীয় পুরুষ অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করিলেন। মেসের শিক্ষা আশানুরূপ ফলপ্রদ বলিয়া পিতৃদেবের মনে হইল না। আদি-ব্রাহ্মসমাজের নবীন আচার্য্য শ্রীযুক্ত অয্যোধানাথ পাকড়াশী অন্তঃপুরে শিক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তখন আমার সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বৌঠাকুরাণী তিনজন, মাতুলানী, দিদি ও আমরা ছোট তিন বোন সকলেই তাঁহার কাছে অন্তঃপুরে পড়িতাম।...

বঙ্গমহিলার সাধারণ-প্রচলিত একখানি মাত্র শাড়ি পরিধানে অনাত্মীয় পুরুষের নিকট বাহির হওয়া যায় না, এই উপলক্ষে অন্তঃপুরিকাগণের বেশও সংস্কৃত হইল। দিদি, আমাদের মাতুলানী এবং বৌঠাকুরাণীগণ একরূপ সুশোভন পেসোয়াজ এবং উড়ানী পরিয়া পাঠাগারে আসিতেন। বাঙালি মেয়ের বেশের প্রতি আজীবন পিতামহাশয়ের বিতৃষ্ণা এবং তাহার সংস্করণে একান্ত অভিলাষ ছিল। মাঝে মাঝে মাত্র দিদিদের, কিন্তু অবিশ্রান্ত তাঁহার শিশুকন্যাদিগের উপর পরীক্ষা করিয়া, এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টারও তিনি ত্রুটি করেন নাই। আমাদের বাড়িতে সেকালে খুব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সম্ভ্রান্ত ঘরের মুসলমান বালক-বালিকার ন্যায় বেশ পরিধান করিত। আমরা একটু বড় হইয়া অবধি তাহার পরিবর্তে নিত্য নূতন পোষাকে সাজিয়াছি। পিতামহাশয় ছবি দেখিয়াছেন, আর আমাদের পোষাক ফরমাস করিয়াছেন। দরজি প্রতিদিনই তাঁহার কাছে হাজির, আর আমরাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাসকরা মাগ।

(সামাজিক প্রহসন)

স্ত্রী স্বাধীনের এই ফল।
পতি হয় পায়ের তল ॥

শ্রীরাধাবিনোদ হালদার প্রণীত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু এত পরীক্ষাতেও তিনি আমাদের জন্য বেশ একটি পছন্দসই বেশ ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই। মেজ বধূঠাকুরাণী বোম্বাই হইতে গুর্জ্জর মহিলার অনুকরণে সুশোভন সুদর্শন পরিচ্ছদে আবৃতা হইয়া যখন দেশে প্রত্যাগমন করিলেন তখনই তাঁহার ক্ষোভ মিটিল। দেশীয়তা, শোভনতা ও শীলতার সর্ব্বাঙ্গীন সম্মিলনে, এ পরিচ্ছদ তিনি যেমনটি চাহিয়াছিলেন, ঠিক সেইরকম মনের মতনটি হইয়া, বঙ্গবালাদিগের ঐকান্তিক একটি অভাবমোচনে তাহার অনেক দিনের বাসনা পূরণ করিল।

[সেকেলে কথা, স্বর্ণকুমারী দেবী; অভিজিৎ সেন, অভিজিৎ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ও সংকলিত : *সেকেলে কথা: শতক সূচনায় মেয়েদের স্মৃতিকথা,* কলকাতা, ১৯৯৭।]

এই উদ্ধৃতির 'দেশীয়তা, শোভনতা ও শীলতার সর্ব্বাঙ্গীণ সম্মিলন' মনোভাবটিই হয়ে দাঁড়াবে শেষ উনিশ শতকে বাঙালি মেয়ের পোশাক-সংক্রান্ত ডিসকোর্সের মূল কথা। অর্থাৎ যুগের প্রয়োজন অনুসারে 'আধুনিক', অথচ পাশ্চাত্যের অনুকরণ থেকে সম্পূর্ণ বাইরে বেরিয়ে এসে দেশীয় স্থানাঙ্ক নির্ণয়ের চেষ্টা। কিন্তু যেকোনও 'আধুনিক' ডিসকোর্সকে প্রতিষ্ঠা দিতে গেলে তার মূল বক্তব্যটিকে ঐতিহাসিকভাবে 'সাজিয়ে নিতে' হয়। রোলাঁ বার্ত তাঁর 'Myth Today' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধে যেমন বলেছিলেন : 'it is human history which converts reality into speech...mythology can only have an historical foundation, for mythology is a type of speech chosen by history; it can possibly evolve from the nature of things...speech of this kind is a message. It is therefore by no means confined to oral speech. It can consist of modes of writing or of representations.

[*Mythologies;* Vintage Books, London, 2009; P-132]

অসংখ্য লেখাপত্রের মধ্য দিয়েই যে পোশাক সংক্রান্ত বিতর্কের পরিসরটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিকশিত হচ্ছিল সেদিন, আগেই বলা হয়েছে, প্রথমে পুরুষ লেখকরা শুরু করলেও ক্রমে মহিলা লেখকরা যথেষ্ট সংখ্যায় এই পাবলিক বিতর্কের পরিসরটিতে নিজেদের কথা বলতে থাকেন। তবে, এই সব লেখার মধ্য দিয়ে একটি প্রধান যুক্তিকাঠামোর ধাঁচ, প্রায় সর্বাত্মক মান্যতা পাচ্ছিল সেদিন। সেটি হল, ক্রমাগত, 'প্রাগাধুনিক' থেকে 'আধুনিক', 'অসভ্য' থেকে 'সভ্য' হয়ে ওঠার অগ্রগতির পথে পোশাকমনস্ক হয়ে ওঠার তীব্র প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা। একধরনের বিপরীত যুগ্মক যেন মান্যতা পাচ্ছিল, পোশাক সংক্রান্ত বিতর্কের গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে :

সভ্যতার অগ্রগতি/ আদিম অসভ্যতার পশ্চাৎগতি, বর্বরতা
আধুনিকতা/ চিরাচরিত প্রাচীনতা
আধ্যাত্মিকতা/ জৈবিকতা বা পৈশাচিকতা
যুক্তিবাদিতা/ অযৌক্তিক অন্ধকার
শোভনতা/ অশালীনতা
উচ্চনৈতিকতা/ যৌন বা শারীরিক

প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রথম 'গুণ'টিই 'পোশাক' বিষয়ে সচেতনতার উন্নততর ফল হিসেবে গ্রাহ্য, যা দ্বিতীয় 'অপকৃষ্ট' রুচির বিপরীতে প্রথম গুণটিকে মান্যতা দিচ্ছে একমাত্রিকভাবে। সভ্যতার অগ্রগতি এবং মানুষের পোশাকসচেতনতা যে সমানুপাতিক, তার নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক এবং নান্দনিক ব্যাখাও পাওয়া যাচ্ছে এসময়ের লেখাগুলিতে। লক্ষণীয়, শালীনতা/অশালীনতা-সংক্রান্ত যুক্তিগুলি খুবই বেশি মাত্রায় এই লেখাগুলিতে 'লিঙ্গায়িত' (gendered), এমনকি যখন মহিলারাও লিখছেন, তখনও তাঁদের দৃষ্টিকোণ সমাজের চেনা পুরুষতান্ত্রিক ছাঁচ থেকে বেরোতে পারছে না। অর্থাৎ পোশাক সংক্রান্ত বিতর্কটি কেবল কী ধরনের পোশাক পরা উচিত সেই বিবরণেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় আষাঢ় ১২৭৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত সৌদামিনী খাস্তগিরি বা কুমারী সৌদামিনীর লেখা একটি প্রবন্ধ 'লজ্জা'। এই প্রবন্ধে ভদ্রমহিলার 'শরীর'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং পোশাকের সম্পর্কটি ঠিক কীরকম তা বুঝতে চাওয়া হয়েছে, সামাজিক-সাংস্থানিক অর্থ হিসেবে নারীশরীরের স্থানাঙ্ক ঠিক কোন্‌খানে। অর্থাৎ পোশাক এখানে হয়ে উঠেছে একধরনের নৈতিক বিনিয়োগ, যার সাহায্যে সভ্যতার স্তরপরম্পরায় আমাদের অগ্রগতির মাপকাঠি নির্ধারিত হতে পারে :

> লজ্জা দুই প্রকার, তন্মধ্যে একটি মনুষ্যকে পাপ কষ্ট হইতে বিরত রাখে, অন্যটি স্ত্রীলোকের। স্ত্রীলোকেরটি এই প্রকরণে লেখা যাইতেছে। "স্ত্রীলোকের লজ্জাবতী হওয়া উচিত।" এই কথা পৃথিবীতে এমন কোনো জাতি নাই যাহারা অস্বীকার করেন।...সামাজিক রীতিনুসারে উহা স্ত্রীলোকের নিয়ম দেশভেদে ভিন্নপ্রকার, এক দেশে যাহা লজ্জার চিহ্ন বলিয়া গণিত হয়, অন্য দেশে উহা নির্লজ্জতার চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত হয়। ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি সভ্যতম দেশে নৃত্যগীতাদি করিলে তদ্দেশীয়া স্ত্রীগণ প্রশংসণীয় হন এবং তাঁহারা সকলের সহিত আলাপ ও প্রকাশ্য স্থানে গমনাগমন করিয়া থাকেন। বঙ্গীয় স্ত্রীগণ তদ্রূপ করিলে প্রশংসণীয়া হওয়া দূরে থাকুন, জঘন্য রূপে নিন্দনীয়া হইয়া থাকেন এবং প্রকাশ্য স্থানে গমনাগমনের ও সকলের সহিত আলাপের পরিবর্তে অবগুণ্ঠনের দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া থাকেন ও কাহারও সহিত আলাপাদি করেন না। কিন্তু অবগুণ্ঠন দ্বারা বদন আচ্ছাদন করিয়া কাহারও সহিত আলাপ না করিলেই লজ্জাবতী হওয়া যায় এমন নহে। বরং লোকের সহিত আলাপাদি না করাতে অহঙ্কার প্রকাশ পায়। যাঁহারা প্রকৃত লজ্জাবতী, তাহাদিগের হৃদয়ে অহংকার ও ঔদ্ধত্য থাকিতে পারে না এবং তাহা নম্রতা বিনয় সুশীলতা শান্তভাব ইত্যাদি সদ্‌গুণ দ্বারা সম-অলঙ্কৃত হয়।

প্রকৃত লজ্জার অন্য একটি নাম শীলতা (modesty) এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাহারা প্রকৃত লজ্জাবতী, তাঁহাদিগের অন্য নাম লজ্জাশীলা। বঙ্গীয়া অনেক মহিলা সামাজিক নিয়ম রক্ষার্থে ও লোকনিন্দার ভয়ে বাহ্যিক লজ্জা প্রদর্শন করেন কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? যাঁহাদিগের হৃদয় সলজ্জ নহে, কেবল নিন্দা ভয়ে আপনাদিগকে লজ্জাবতী দেখান, তাঁহারা লোকের নিকট প্রশংসনীয় হন বটে। কিন্তু আপনাদিগকে কপটরূপ-পাপে লিপ্ত করেন। যাঁহারা বাস্তবিক লজ্জাবতী তাঁহারা কখন কপট হইতে পারেন না, তাহাদিগের হৃদয় সারল্যগুণে বিভূষিত এবং তাহাদিগের আচার ব্যবহার আলাপ প্রণালী ইত্যাদি সকল বিষয়েই প্রভূত লজ্জার ভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু লজ্জাবতী হইবে বলিয়া একেবারে অসভ্যের ন্যায় হওয়া উচিত নয়। তাহা হইলে কুৎসিত লজ্জা আসিয়া পড়ে।

বঙ্গীয় অনেক মহিলা কুৎসিত লজ্জার বশবর্তী। তাঁহারা অতি সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন এবং অনাবৃত শরীরে দাসদাসী ইত্যাদি পরিজনের সম্মুখে অনায়াসে থাকেন। কোনো মহিলা অবগুণ্ঠন দ্বারা বদন আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছেন, এদিকে আবার চিৎকার স্বরে কুৎসিত রূঢ় বাক্যাদি প্রয়োগ করতঃ কোন কোন ব্যক্তির সহিত এমনভাবে বিবাদ করিতে থাকেন যে, যে ব্যক্তি কখন তাহার মুখাবলোকন করেন নাই তিনি তাহার বদন বিনিঃসৃত পরুষ ভাষা শুনিতে পান...অতএব এরূপ নিয়ম করা উচিত যে অনুমতি বিনা দাস দাসী কিংবা অন্যান্য পরিজনেরা সকল গৃহে প্রবেশ করিতে না পারেন এবং স্নান ইত্যাদি গোপনীয় স্থানে সম্পাদিত হয়। লৌকিক আচারে যে নারীগণ অনভিজ্ঞ, ইহা কেবল কুৎসিত লজ্জাবশতঃ হইয়া থাকে। কোন ভদ্র ব্যক্তি, তাঁহাদিগের সহিত আলাপাদি করিতে আসিলে তাঁহারা মৌনী হইয়া থাকেন। অথবা সেস্থান হইতে প্রস্থান করেন। সভ্যতম প্রদেশে এরূপ আচরণ করিলে যৎপরোণাস্তি নিন্দনীয় হইতে হয়। লোকের সহিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরূপভাবে আলাপ করা উচিত যে তাহাতে মনে কোনো কু-ভাবোদয় না হয়।

ভদ্রমহিলার পোশাক সংক্রান্ত আলোচনা এবার ঢুকে পড়ছে বাঙালি রুচিশীল মহিলার শালীন, প্রায় অ-যৌন, স্যানিটাইজড এক মূর্তি নির্মাণে। পুরোনো অবরোধ প্রথা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। 'আধুনিক' বাঙালি সমাজে নারী-পুরুষের পারস্পরিক বিনিময় এক অনিবার্য দাবি, তবু সেখানেও নারীর তরফ থেকে এক কাম্য মার্জিত ব্যবহারই কাঙ্ক্ষিত। কৃষ্ণভাবিনী দাসের 'স্ত্রীলোক ও পুরুষ' প্রবন্ধেও দেখা যায় নারীত্বের কেন্দ্রীয় গুণ হিসেবে দেখানো হচ্ছে 'লজ্জা'কে। আর 'লজ্জা'-র সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে 'সভ্যতা'র অগ্রগতিকে।

এভাবেই প্রাচীন আর্যসভ্যতার সূত্র ধরে 'আধুনিক' পাশ্চাত্য প্রভাবিত বাঙালি সমাজ পর্যন্ত মেয়েদের পোশাক সংক্রান্ত নৈতিকতার এক মেটান্যারেটিভ তৈরি হচ্ছে। 'বামাবোধিনী' পত্রিকার বৈশাখ ১৩০২ সংখ্যায় নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী লিখছেন একটি প্রবন্ধ : 'অবরোধে হীনবস্থা।' সেখানেও এই মহাবাচনটি উপস্থিত :

> আমাদের দেশে আমাদের সমাজে স্ত্রীজাতির জন্য যে অবরোধ প্রথা প্রচলিত আছে আমরা এ প্রথা ভালো বিবেচনা করি না। এই অবরোধ প্রথাই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল, এই অবরোধ প্রথাই আমাদের হীনাবস্থার কারণ। আমরা পিঞ্জরের পাখীর ন্যায় নিয়ত অবরোধরূপে পিঞ্জরে আবদ্ধ রহিয়াছি, কাজেই আমাদের মনোবৃত্তি সকল ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রস্ফুটিত হইতে পারিতেছে না।... সৎজ্ঞান ব্যতীত দুর্লভ মানবজীবন পশুর অপেক্ষাও হেয় ভাবে যাপন করিতে হয়। আমরা বাল্যকাল হইতে পিঞ্জরাবদ্ধ। আমরা সৎজ্ঞান কোথায় পাইব?...যদি আমাদের প্রতি সমাজের এক বিন্দু কৃপাদৃষ্টি থাকিত, তাহা হইলে আমরা আর্যবংশীয়া বলিয়া পরিচিত হইতে পারিতাম,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের জীবনও আর্য্য মহিলাদিগের ন্যায় পবিত্র ও উন্নত হইত। আর্য্যমহিলাদিগের জন্য অবরোধপ্রথা প্রচলিত ছিল না। তাঁহারা স্বইচ্ছায় এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়া অরাতিমস্তক দ্বিখণ্ডিত করিতেন। তাঁহাদের এতদূর পর্যন্ত ক্ষমতা ছিল। তাঁহাদের শরীরও যে রক্তমাংসে গঠিত আমাদের শরীরও সেই রক্তমাংসে গঠিত, তবে তাঁহারা অধিক বলশালিনী ও অধিক ক্ষমতাসম্পন্না ছিলেন কেন? আমরাই বা এত হীনবল কেন? ইহার একমাত্র কারণ সমাজ নয় কি? সমাজ তাঁহাদিগকে পালিতপক্ষীর ন্যায় অবরোধরূপে পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই...

এই বক্তব্যের ভিতর শেষ উনিশ শতকীয় বাঙালি জাতীয়তাবাদী অভীপ্সা ধরা পড়েছে, যেখানে অধঃপতিত বর্তমানকে কোনও এক শ্রেষ্ঠ নৃতাত্ত্বিক অতীতের ধারাবাহিকতা হিসেবে দেখানো হয়েছে। এই দৃষ্টিকোনকেই আরও সুবিস্তৃতভাবে 'ইতিহাসায়িত' (historisize) করা হয়েছে 'অন্তঃপুর' পত্রিকার আষাঢ়, ১৩০৮ সংখ্যায়, অজ্ঞাতনামা রচিত 'মহিলার পরিচ্ছদ' প্রবন্ধে :

পরিচ্ছদ কি এবং তাহার প্রয়োজনীয়তাই বা কিরূপ? তাহাই পরিচ্ছদ যাহা পরিধান করিয়া শরীরকে আচ্ছাদিত করিতে পারা যায় এবং যাহা দ্বারা লজ্জা নিবারণ হয়। পৃথিবীর অতি আদিম অবস্থার ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সেই কালে মানবজাতির পরিধানের বস্ত্র ছিল না।...তৎপরে ক্রমে মানুষ যত সভ্য হইয়াছে, ততই বুদ্ধিকৌশলে নানা বস্তুর দ্বারা শরীর আচ্ছাদনের উপযুক্ত বস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছে।...ইংরাজ রাজত্বে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি ও যাতায়াতের সুবিধা হওয়া প্রযুক্ত নানাদেশীয় বস্ত্র আমদানি হইতে আরম্ভ করিল।

আর্য্যনারীগণ পুরাকালে যেভাবে বস্ত্র পরিধান করিতেন, তাহার সহিত বর্তমান পরিচ্ছদের কোন সাদৃশ্য নাই বলিলেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অত্যুক্তি হয়। সেই সময়ে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে বা রাজসভা প্রভৃতি প্রকাশ্য স্থানে আর্য্যনারীগণ স্বাধীনভাবে যাতায়াত করিতেন। অনেক স্থলে পতি বা ভ্রাতার সহিত সহধর্মিনী বা ভগিনীকে অশ্বারোহনে গমন করিতে হইত। সুতরাং তৎকালীন স্ত্রীলোকদিগকে কেবল বাহারে মনোহর বস্ত্র পরিধান উপযোগী হইত না।... অশ্বারোহনের ও যুদ্ধযাত্রার সুবিধার জন্যই বোধহয় স্ত্রীলোকেরা কাচা এবং কোচা দুই দিতেন এবং সেই জন্য আমাদিগের শাড়ি অপেক্ষা তাহাদিগের বস্ত্রের পরিমান আরও অধিক হইত।

মুসলমানধিকার সময় হইতে ভারতমহিলাকে সতীত্ব রক্ষার জন্য গৃহের অভ্যন্তরে আবদ্ধ হইতে হইয়াছে। বাহিরে যে সময় যাতায়াত করিতে হইত, সেই পুরাকালে যেমন পুরু ও সুদীর্ঘ বস্ত্রের প্রয়োজন ছিল, অধুনা গৃহকোণে-পুরুষের চক্ষুর অন্তরালে আর তদ্রূপ বস্ত্রের আবশ্যকতা রহিল না। সেই সময় জ্ঞানচর্চার অধিকার হইতেও রমণীগণ বঞ্চিতা হইলেন এবং পুরুষের মনোহারিণী ক্রীড়া পুত্তলিমাত্র সাজিয়া অন্তঃপুরে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তৎকালীন নবাব বেগমদিগের অনুকরণে ভারত নারীগণ অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহার আরম্ভ করেন। তাহারই ফলস্বরূপ বঙ্গ গৃহে কুলবধূগণ একমাত্র সূক্ষ্ম শাড়ী পরিধান করিয়া গঙ্গাস্নান বা নিমন্ত্রণাদিতে বহুলোক সমাকীর্ণ স্থানে যাইতেও লজ্জা বোধ করিতেন না। যাহা হউক একখানা সূক্ষ্ম বস্ত্র মাত্র পরিধান প্রথা কুরুচিসঙ্গত বলিয়া বর্তমান সময় অনেকেই বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং সুখের বিষয় এই কুরুচির ক্রমেই অন্তর্দ্ধান হইতেছে। সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রায় ধনী মহিলারাই ব্যবহার করেন। ইতর স্ত্রীলোকেরা মোটা পুরু বস্ত্র পরিধান করেন।...আমরা চিরকাল পরমুখাপেক্ষী, আমাদের নিজেদের কিছু নাই বলিলেও হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্তমান সময়ে স্ত্রী স্বাধীনতার যেরূপ বিস্তার হইতেছে, ইহার প্রভাবে ভারতের যেমন সকল দিকে পরিবর্তন ও নূতনভাবে গঠন হইতেছে, তেমনি বঙ্গমহিলার পরিচ্ছদের প্রথারও উন্নতি হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল একখানা বস্ত্রের দ্বারা সকল অবস্থায় লজ্জা রক্ষা করিয়া স্বাধীনভাবে সর্ব্বসম্মুখে যাতায়াত করা অসম্ভব। কেবল ঘোমটা টানিলেই যে লজ্জা রক্ষা সম্ভবপর নহে, তাহা একটি দশম বৎসরের ক্ষুদ্র বালিকাও বুঝিতে সমর্থ।...

এরপরেই লেখিকা মেয়েদের পোশাক-সংক্রান্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয়টিতে প্রবেশ করেছেন। 'আধুনিক' যুগের উপযোগী মেয়েদের পোশাককে একইসঙ্গে বাঙালি 'জাতীয়তা'র সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ হতে হবে, এই মর্মে লেখালেখি এবং বাস্তব পরিসরেও নিত্যনতুন পরীক্ষানিরীক্ষামূলক পোশাকের প্রস্তাব পেশ হতে থাকে। লেখিকার জবানিতে :

এদেশে ইংরাজ জাতির আগমনে ও তাহাদের সহিত মেশামিশি দ্বারা...আমরাও নানাপ্রকারের সেমিজ, পেটিকোট, বডি ও জ্যাকেট ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছি। ইতিপূর্বে আমাদের জাতীয় এমন কোনও স্ত্রীপরিচ্ছদ ছিল না, যাহা পরিধান করিয়া আত্মসম্মান রক্ষা করা যাইতে পারিত। বোধহয় সেইজন্যই অনেক ভারতমহিলা ইংরাজ মহিলাদের পোশাক পরিধান করিয়াছিলেন। ইংরাজ বাঙালীর শক্তিতে যেমন প্রভেদ, গাউন ও শাড়ী শক্তিরও তেমন পার্থক্য আছে। অনেকে বাহিরে যাতায়াতের সুবিধার জন্য শাড়ি পরিত্যাগ করিয়া গাউন পরিধান করেন...দুঃখের বিষয় যে আমরা ইংরাজ রমনীর অনুকরণে জ্যাকেট সেমিজ প্রভৃতি ব্যবহার করিতে শিখিয়া যেমন সুখী হইয়াছি, অপরদিকে বিলাসিতার প্রলোভনে পড়িয়া তাহাদের কুপোশাকগুলি ব্যবহার করিয়া রুগ্ন ও দরিদ্র হইতেছি। বর্তমান সময়ে পারসী মহিলাদের পোশাকের অনুকরণে ব্রাহ্ম মহিলাদের যে পোশাকের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকেই গ্রহণ করিতেছেন। অন্তঃপুরেও অনেকে এই পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে শিখিয়াছেন। অনেক ইংরাজ মহিলার মুখেও উক্ত পোশাকের প্রশংসা শুনিয়াছি। ইহা সাধারণভাবে বিলাসিতা ও বিজাতীয় দোষবর্জ্জিত এবং সর্বশ্রেণীর মহিলাগণ অবস্থানুসারে ব্যবহার করিতে পারেন কিনা এবং এই পরিচ্ছদ ভবিষ্যতে বঙ্গ মহিলাগণের সাধারণ পরিচ্ছদ হইতে পারে কিনা, আলোচনা করিয়া দেখিলে ভালো হয়।

অর্থাৎ একদিকে পোশাক-সংক্রান্ত ভ্যালু জাজমেন্ট, অন্যদিকে এর ব্যবহারিক উপযোগিতা, দুটোই এই আলোচনায় এসেছে। বস্তুত, শেষ উনিশ শতক থেকে বিশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত বাঙালি মেয়ের পোশাক বিতর্কের এটাই ছিল মূল যুক্তিকাঠামো। ১৮৮০র দশকেই 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় রাজলক্ষ্মী সেন একটি প্রবন্ধে বলেন 'প্রত্যেক দেশের লোকেরই কি পরিচ্ছদে কি আচার ব্যবহারে স্বীয় স্বীয় দেশের চিহ্ন রাখা কর্তব্য। এইজন্য সম্পূর্ণরূপে অন্য দেশের অনুকরণ করা উচিত নয়। তাহাতে হীনতা প্রকাশ পায়। অন্য দেশে ধর্ম বিষয়ে কিংবা চরিত্র বিষয়ে যে সকল উত্তম ভাব আছে, তাহা গ্রহণ করিব, কিন্তু বাহ্যিক বিষয়ে সকলের অনুকরণ করিবার কোনো আবশ্যকতা নাই।' ১২৭৮ সালেই 'বামাবোধিনী পত্রিকা' অগ্রণী ব্রাহ্মপরিবারের মহিলাদের ভিতর একটি সার্ভে চালান, বাঙালি মেয়েদের আদর্শ পোশাক কিরকম হওয়া উচিত সে বিষয়ে। মেয়েদের কাছ থেকে মতামত নিয়ে মোটের উপর একটি আদর্শ পোশাকবিধি প্রকাশিত হয়েছিল ওই পত্রিকায়। সেটি নিম্নরূপ :

বাটীতে : ইজার পিরান সাটি অথবা লম্বা
পিরান ও সাটী
বাহিরে গমনকালে : ইজার, পিরান, সাটী,
চাদর, পাজামা, জুতা। জুতা যাহারা
পছন্দ করেন না, পরিতে পারেন না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিচ্ছদ দ্বারা বিধবা, সধবা ও কুমারীভেদ চিহ্নিত হওয়া আবশ্যক।

এই পুরো বিতর্কটাই চালু চিল বিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত, যতদিন না, বিশ্বযুদ্ধ, মন্দা, অর্থনৈতিক ভাঙন বাঙালি নারীকে বাস্তবিক বহির্জগতের প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্রে নেমে আসতে বাধ্য করে। তাই দেখা যায় 'ভারতী' পত্রিকার ফাল্গুন ১৩৩০, ৪৭ বর্ষ, একাদশ সংখ্যায় জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধ লিখছেন, শিরোনাম 'গাউন-শাড়ী'। ভাষা অনেক সহজ হয়ে এসেছে, একইসঙ্গে গোটা বিতর্কের ঐতিহাসিক পরিসরটিও নিরপেক্ষ দূরত্ব থেকে ধরা পড়েছে :

> এই শ্রেণির সমালোচকদের মধ্যে একটা ধারণা দেখা যায় যে মেয়ে শিক্ষিতা হলেই সে দিনের বেলায়ও বিলাতী ইভনিং ড্রেস পরে উঁচু হিলের বুট পরে রাস্তায় চলবে। একটা দিন ছিল যখন স্ত্রী-স্বাধীনতার নূতন প্রবর্ত্তকদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই বিলাতী পোশাকে দেহ সজ্জিত করতেন। পোশাকটার প্রতি তাঁদের গভীর ভালোবাসা থেকে কিংবা এটাকেই শিক্ষার ও স্বাধীনতার অপরিহার্য অঙ্গ বলে তাঁরা এই পোশাককে গ্রহণ করেননি। পোশাকটি ইংরেজি ন্যায়শাস্ত্রের কথায় accident, তাও invariable নয়, এর বিশেষ কোনও মূল্য নাই, কারণ এ সর্বদাই বদলানো চলে, কিন্তু এটাকে তখন তাঁদের মতের বাহ্যিক প্রকাশ বা symbol হিসাবে তাঁরা ধারণ করেছিলেন, যেমন নাকি আজকার এই গান্ধীযুগে অসহযোগীর দল খদ্দর পরে তাদের মত প্রকাশ করছেন।
>
> পোশাকটা যেখানে জাতীয়তার বিরোধীভাব প্রকাশ করে বলে মনে হয়েছে সেখানে শিক্ষিত পুরুষ বা শিক্ষিতা নারী তাকে ব্যবহার করতে চাননি তার প্রমাণও অনেকবারই পাওয়া গেছে। অধিকাংশ শিক্ষিতা মেয়ে শতকরা ৯৯ জন বল্লে অত্যুক্তি হবে না, শাড়ীকে যেরকম রুচির ও শোভন মনে করেন, গাউনকে সেরকম করেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। আমাদেরই পরিচিতা গাউন-পরিহিতা ভারতবর্ষীয়াদের জিজ্ঞাসা করে এই উত্তর পেয়েছি, "ভাই আমাদের কাজের খাতিরে পথে চলাফেরা করতে হয়, শাড়ী পরে চলাফেরা করলে নিজেদের সম্মান বজায় রাখতে পারি না, তাই গাউন পরি।" এটা যে কত বড় দুঃখের ও লজ্জার কথা, দেশের পুরুষদের কত বড় গ্লানিকর হীনতার পরিচায়ক, যারা শিক্ষিতাদের বুট-গাউন পরা নিয়ে সমালোচনা করেন, তারা ভেবে দেখেছেন কি?

এদেশে লজ্জা-কুণ্ঠিতা মেয়েদের বাহিরের কাজে না আনাই ভালো। 'বাঙ্গালী' ছেলে যারা মানুষ হতে শেখেনি, তাদের কাছে সহজ সরল ভাব নিয়ে নারী কর্মক্ষেত্রে আসে যদি তো বিপদে পড়ে—তাদের কাছে হতে হয় aggressive—কাজে কাজেই বঙ্গ নারীকে বাহিরে অনেক সময় ফিরিঙ্গিয়ানায় মন্ডিত হতে হয়। বাঙালীত্ব বজায় রেখে শাড়ী পরে যে-সব মেয়ে বাহিরের কাজে একাকিনী এসেছেন, তাঁদের অনেককেই অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়েছে।

এখানে যেমন ১৯২০-৩০ এর দশকের জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে শাড়ির ব্যবহারের প্রাসঙ্গিকতা মিশে গেছে, সেইসঙ্গে নতুন যুগের প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে শাড়ি হয়ে উঠেছে বাঙালি মেয়ের functional বা ব্যবহারিক পোশাক। সেই সঙ্গে পথে-ঘাটে পুরুষের যে অভব্যতার মুখোমুখি হতে হয় মেয়েদের, তার প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে একধরনের সদ্য উন্মেষিত নারীবাদী চেতনার ছবিও পাওয়া যাচ্ছে এখানে।

৫

এই পোশাক-সংক্রান্ত নববিধানের মধ্য দিয়ে সেদিন ইংরেজিশিক্ষিত ভদ্রলোকশ্রেণির ক্ষমতা প্রদর্শন ও ক্ষমতার সংহতকরণ প্রক্রিয়াই জোরদার হয়েছিল। শরীরকে সুনির্দিষ্ট পোশাকে মুড়ে ফেলে নাগরিক অগ্রণী সমাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেদিন বাঙালি মেয়ের শরীরের অ-যৌনকরণ (de-sexualization) ঘটাচ্ছিল। শরীরকে কঠোর নিয়ন্ত্রণে না এনে মুক্তির আবহে তার উপর আর এক ধরনের অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণ চাপানোর নামই বাঙালি ভিক্টোরিয়ানা। এক্ষেত্রে শ্রেণি দৃষ্টিকোণও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। পোশাকবিধি সংক্রান্ত এই নীতিনিয়ম মূলত সীমাবদ্ধ থেকেছিল শহর-গ্রামের বিত্তবান শ্রেণির ভিতরে। দেশের বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষ ছিল এর আওতার বাইরেই। আসলে সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনীতির পরিসরে শিক্ষিত মহিলাদের পদার্পণই বাঙালি পুরুষতন্ত্রের কাছে একধরনের 'উৎকণ্ঠা'র (anxiety) জন্ম দিচ্ছিল। সেই সঙ্গে ইউরোপ থেকে শেখা সভ্যতা/বর্বরতার 'কোড'-গুলিও বাঙালি পিতৃতন্ত্রের মননে শরীর-যৌনতাকে অশ্লীল ও বর্জনীয় ভাবতে শিখিয়েছিল। তাই মেয়েদের খোলা শরীর সম্পর্কিত উৎকণ্ঠা এতোটা বড় আকার নেয়। সেকারণেই মেয়েদের লেখাতেও পাই পুরুষেরই কণ্ঠস্বর। কৃষ্ণভাবিনী দাসের মতো পাশ্চাত্যপন্থী লেখিকাও তাঁর 'স্ত্রীলোকের কাজ আর পুরুষের কাজ' প্রবন্ধে বলেছিলেন স্ত্রীলোকের কাজ ঘরের ভিতরেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত, বাইরের পাবলিক পরিসরটিতে পুরুষেরই একাধিপত্য থাকা উচিত। বাঙালি মেয়ের শারীরিক উপস্থিতিকে, তার যৌন সত্তাকে অবদমিত করে, সমাজকে স্যানিটাইজ্‌ড করার এই বাঙালি শিক্ষিত এলিট ভিক্টোরীয় প্রকল্প আসলে নব্য ঔপনিবেশিক বিত্তবান শ্রেণির মেয়েদের আরও একধরনের যৌক্তিক, এনলাইটেন্‌ড গণ্ডির ভিতর আবদ্ধ করে রাখার নব্য প্রকল্প। বিশ শতকে পৌঁছে স্বদেশী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও অযৌন, অপাপবিদ্ধ দেশমাতৃকার প্রতীক নারীমূর্তির আইকন হয়ে ওঠে জাতীয় পোশাক। পাশ্চাত্যপন্থী কৃষ্ণভাবিনী দাস বিধবা হবার পর বিলিতি পোশাক পরিত্যাগ করেন। সরোজকুমারী দেবী 'ভারতী' পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৩২৯ সংখ্যায় 'কৃষ্ণভাবিনী দাস' প্রবন্ধে লিখেছেন, কীভাবে বৈধব্য চিহ্নিত সাদা পোশাকে কৃষ্ণভাবিনী হয়ে উঠেছিলেন শ্রদ্ধা ও সম্মানের পূজনীয় অধিকারী। সরলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবী তাঁর 'স্বদেশী পোশাক' প্রবন্ধেও অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সঙ্গে জাতীয় পোশাককে মেয়েদের 'শোভনতা', 'শালীনতা' এবং 'শীলতা'-র সঙ্গে একাত্ম করে দেখিয়েছেন। এভাবেই জাতীয়তাবাদী নৈতিকতা 'ভালো মেয়ে' এবং 'খারাপ মেয়ে'র পার্থক্য তৈরি করে এবং যৌন অবদমন, শরীরকে অস্বীকার করা, বৈধব্যকে 'জাতীয়তাবাদ' গুণ হিসেবে মহিমান্বিত করে। পূর্বোক্ত 'ভারতী' পত্রিকার ১৯২২ সালের একটি সংখ্যায় 'স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ' প্রবন্ধে সৌদামিনী খাস্তগিরি বলেছেন যেকোনও পোশাকই পরা হোক না কেন, সর্বাঙ্গ একটি শাল বা চাদর জাতীয় কাপড় দিয়ে মুড়ে রাখাটাই রুচিবান ভদ্রমহিলার অবশ্যকর্তব্য হওয়া উচিত। এভাবেই 'শরীর' হয়ে উঠল একধরনের 'নেগেটিভ সিগনিফায়ার' যার মাধ্যমে দেশীয় নব্য পুরুষতন্ত্র 'সভ্যতার' মোড়কে আর একরকম 'এনক্লোজার' তৈরি করল মেয়েদের শরীরের উপর।

ক্ষমতার চরিত্রই হল যেকোনও ধরনের বৈপরীত্যকে এক ছাঁচে ঢেলে তাকে পিটিয়ে সমান করা। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দূতীবিলাস' এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম পেঁচার নকসা'-য় সদ্য-ঔপনিবেশিক সমাজে বাঙালির পোশাকের যে 'হেটেরোজেনাস' চরিত্র দেখা যায় শতক শেষের ভিক্টোরীয় বাঙালি তাকে 'হোমোজেনাস নরম্যাটিভ' চরিত্রে এনে ফেলবেন। সেই নরম্যাটিভিটি স্বদেশী যুগ অব্দি চলেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ, স্বাধীনতার পর পাবলিক পরিসরে মহিলারা বিরাট মাত্রায় অংশগ্রহণ করতে শুরু করলেও ওই একমাত্রিক ড্রেসকোড যে তাদের জন্য গ্রহণযোগ্য করে রাখা হয়েছিল তা বোঝা যায় ষাট-সত্তর দশকের বাংলা ছবির নায়িকাদের পোশাক দেখলেই। সত্তর-আশির দশকেও বাংলা ছবিতে নায়িকা এবং খলনায়িকা বা ভ্যাম্পের পোশাকের অত্যন্ত স্পষ্ট পার্থক্য ছিল লক্ষণীয়। কিন্তু নব্বই দশকে বিশ্বায়ন-পরবর্তী সময় থেকে ইউনিফর্ম মরাল ড্রেস কোড ভেসে যেতে লাগল পুঁজি আর পণ্যরতির দাপটে। মেনস্ট্রিম বাংলা ছবিতেও বাঙালি মেয়ের সেই বদলে যেতে থাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোশাক যেকোনও নরম্যাটিভ প্রকল্পকেই ভেঙে চুরমার করে দিল।

তবু, আজ এই ২০১৭-তেও, বাঙালি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মননে উনিশ শতকের ভিক্টোরীয় মরাল কোড অবলুপ্ত হয়নি একথা হলফ করেই বলা যায়। ভালো মেয়ে/খারাপ মেয়ের বাইনারি আজও পোশাককে কেন্দ্র করেই তার প্রাথমিক অস্তিত্ব জাহির করে। তাই জিনস্-টপ পরা কলেজের মেয়েটিকে শ্বশুরবাড়িতে এসে হাজারটা অদৃশ্য নজরদারির ঘেরাটোপে বাধ্যতামূলক শাড়িতে এসে আটকে যেতে হয়। জিন্স-এর অপশন তোলা থাকে গরমের ছুটি বা পুজোর ছুটিতে কলকাতার বাইরে পাহাড়ে-জঙ্গলে বেড়াতে গেলে। তাই যাদবপুর প্রেসিডেন্সির মেয়েদের পোশাক আজ শিক্ষিত বাঙালি মননে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে এক মূর্তিমান অস্বস্তি। যদিও এই মর‍্যাল রেগুলেশন খুব দ্রুত ভাঙছে সমাজের সর্বস্তরেই। আরও ভাঙবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। পরপর অনেকগুলি প্রজন্ম হয়তো হ্যাঁ/না-এর টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে মেয়েদের পোশাককে একইসঙ্গে করে তুলবে চূড়ান্ত ফাংশনাল এবং স্বেচ্ছাধীন সেল্ফ ফ্যাশনিং-এর বশবর্তী। যদিও সেই সেল্ফ ফ্যাশনিং-ও অবচেতনে নিয়ন্ত্রিত হবে গ্লোবাল পুঁজির নিজস্ব চাহিদা মেনেই। পোশাকের উত্তর-আধুনিক পরিসরটিতে পৌঁছনোর অপেক্ষায়, আজ এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি আমরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উনিশ শতকের বাংলায় শরীর-যৌনতা-অশালীনতার এলাকা নির্মাণ

'আছেন বাৎসায়ন আর খাজুরাহো
ভাদ্রমাসের বেয়াড়া উৎসাহ
নন্দন, নলবন, ঝিলমিল—বারবার
আর সপ্তাহে একদিন ডায়মন্ডহারবার
ভালো না, এসব ভালো না— বলেছেন শাক্যমুনি
চল ভালো হই ... জমকালো হই — বড়দার
বাতেলা শুনি।'[১]

'চন্দ্রবিন্দু'র গান এভাবেই ধরতে চেয়েছে আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিসরে ভালো/মন্দ, শ্লীল/অশ্লীল, বৈধ/অবৈধ সংক্রান্ত ধারণার বাইনারি বৈপরীত্যকে। বস্তুত, যেকোনো সামাজিক হায়ারার্কির কাছেই এই বিষয়গুলো চিরকালই পুলিসি খবরদারির এক্তিয়ারভুক্ত। এগুলো এমনই এক এলাকার বিষয়বস্তু, যা মূলত অন্ধকারাচ্ছন্ন, গোপনীয়তায় ঢাকা, যেখানে ব্যক্তির কণ্ঠস্বর সর্বদাই চাপা পড়ে যায় প্রাতিষ্ঠানিক 'জ্ঞান' ও 'ক্ষমতা'-র যৌথ অনুশাসনে। 'আধুনিক' সমাজের ইতিহাসে, বিগত কয়েকশো বছর যাবৎ 'জ্ঞান' ও 'ক্ষমতা'-র মেলবন্ধনে সংগঠিত হয়েছে এমন এক নজরদারির কাঠামো, যা প্রায় অবিসংবাদী প্রভুর মতোই প্রতিটি নাগরিকের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছে — কাকে বলে 'নৈতিকতা', 'শালীনতা' বলতে কি বোঝায়, 'শ্লীল'-'অশ্লীল'-এর মাপকাঠিই বা কী। আধুনিক ক্ষমতা নিপীড়নমূলক নয়, বরং উৎপাদনক্ষম যা সামাজিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের অনুমোদন নিয়েই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, যা ব্যক্তিকে দিয়ে 'হ্যাঁ' বলিয়ে নেয় বারবার, সামাজিক 'ব্যক্তি' একসময় লক্ষ করে— যে মতামতগুলো সে নিজের মতামত হিসেবে প্রকাশ করছে, তা আদৌ তার নিজের মতামত নয়। আশৈশব, সামাজিক ক্ষমতাকাঠামোর প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান— পরিবার, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্মীয় সংঘ বা পুরোহিততন্ত্র, রাষ্ট্রীয় পেশিতন্ত্রের অজস্র শাখাপ্রশাখা, সংবাদপত্র, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান—সকলের দ্বারাই নির্মিত হচ্ছে তার 'নিজস্ব' মতামত। নিজেরই অজান্তে তার মনস্তাত্ত্বিক ছাঁচ তৈরি হচ্ছে এক অদৃশ্য অঙ্গুলিহেলনের সাপেক্ষে। জ্ঞাতসারে-অজ্ঞাতসারে তার একান্ত ব্যক্তিগত অভ্যাসগুলোর উপরেও প্রভাব খাটিয়ে চলেছে কোনও এক 'বড়দার বাতেলা'। আর সর্বত্রই এইসব অনুশাসন-সংক্রান্ত সুতীক্ষ্ণ নজরদারির একটি প্রধানতম বিষয়বস্তু হল — ব্যক্তির শরীর, যৌনতা, যৌন অভ্যেস, যৌন সম্পর্ক, যৌন নৈতিকতা, তথাকথিত 'অশালীন' আচার-আচরণ ইত্যাদি। এই একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়গুলোর সাপেক্ষেই 'ক্ষমতা' নির্ধারণ করে দেয়— কে 'সুস্থ' আর কে 'অসুস্থ'। 'সুস্থতা'র প্রাতিষ্ঠানিক ধারণা 'অসুস্থ'কে অপরায়িত করে। এভাবেই যৌনতা, যৌন অভ্যেস, প্রবণতা—ইত্যাদি একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়গুলোকে পরিণত করা হয় কয়েকটা স্ট্রিমলাইনড স্টিরিওটাইপে। আমাদের আধুনিক সমাজের ইতিহাস এই নির্ধারণবাদের ইতিহাস—যা ব্যক্তির চরিত্রকে এরকম হাজারো বিধিনিষেধের আওতায় এনে, তাকে 'ভদ্র', 'সুসভ্য', 'ব্যালান্সড' উপদ্রবহীন, অনুগত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছে। এই ইতিহাস যেমন আকর্ষণীয় তেমনই জটিল। 'চন্দ্রবিন্দু'র গান যে 'শাক্যমুনি'দের চোখরাঙানিকে উপেক্ষা করার কথা বলে, আধুনিক ইতিহাসের প্রত্যেকটি পর্যায়েই রয়েছে তাদের ভয়ানক উপস্থিতি, 'ব্যক্তি'র উপর তাদের অনিবার্য নিপীড়ন। আর বিপরীতে সেই নিয়ন্ত্রণকে অস্বীকার করে বারবার শিল্পে-সাহিত্যে কথা বলতে চেয়েছে শৃঙ্খলিত 'শরীর'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা বলেছে অবদমিত 'মন', কিনারায় চলে যাওয়া 'অসুস্থ'রা, সমাজপ্রভুদের পায়ের তলা থেকে সরিয়ে নিয়েছে পরম নিশ্চিন্ত কার্পেট।

ইউরোপে সতেরো-আঠারো শতক জুড়ে পুঁজিবাদের উত্থান এবং রেনেশাঁস-এনলাইটেনমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে 'জ্ঞান' ও 'ক্ষমতা'র এক নতুন কাঠামোগত প্রকরণ নির্মিত হল। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা বিকশিত হতে শুরু করল এই 'জ্ঞান' ও 'ক্ষমতা' বৃদ্ধির 'এষণা'কে কেন্দ্র করেই। আধুনিক রাষ্ট্র কেবল নাগরিকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়, তাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য দান বা শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করেই থেমে রইল না— নাগরিকদের জীবনের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করে, প্রকাশ্যে বা সংগোপনে তাদের জীবনের সবকিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করল তা। এই সবকিছুর মধ্যে ঢুকে পড়ল নাগরিকের শরীর, যৌনতা, কামনা-বাসনা ইত্যাদিও। আসলে যৌনতা মানুষের জীবনের এমন একটি অংশ, যার প্রকাশ্য আবরণমুক্ত অভিব্যক্তি প্রায় ঘটানোই যায় না। ফলত, সামাজিক প্রতিষ্ঠান খুব সহজেই মানবমনের এই অপ্রকাশ্য দিকটির উপর সেন্সর জারি করার, তাকে বশ মানানোর সুযোগ পেয়ে যায়। এ প্রসঙ্গেই প্রায় ২০০০ বছরব্যাপী ইউরোপীয় সমাজে খ্রিস্টধর্মের সার্বিক প্রাতিষ্ঠানিক আধিপত্য কায়েম করার বিষয়টি উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রাতিষ্ঠানিক খ্রিস্টধর্মের নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা ঘটার আগে পর্যন্ত গোটা ইউরোপ জুড়ে অসংখ্য বৈচিত্র্যময় 'সাবকাল্ট' ও 'প্যাগান' ধর্মাচারের প্রচলন ছিল। এইসব ধর্মের একটা বিরাট অংশ জুড়ে ছিল শরীর এবং শরীর-কেন্দ্রিকতা। এইসব ধর্মচর্চায় সৌন্দর্যবোধের কেন্দ্রে ছিল শরীর। এমনকি শরীর-সংক্রান্ত মুক্তচিন্তা এতদূর অব্দি পৌঁছেছিল যে সমপ্রেম বা সমকামকেও গ্রহণ করা হয়েছিল অনেক সহজেই। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক খ্রিস্টধর্ম তাদের 'হেরেটিক' আখ্যা দিয়ে, 'বিধর্মী' দমনের নামে তাদের উপর নির্মম অত্যাচার চালাতে থাকে। এইসব প্যাগান, অ-খ্রিস্টান দেহবাদীরা আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যায়। তাদের খ্রিস্টান মতাবলম্বী করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোলা, কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়ে তাদের পরিশুদ্ধ করে তোলার চেষ্টা চলতে থাকে। এই 'পরিশোধনে'র প্রক্রিয়াকে স্থায়িত্ব দিতেই, খ্রিস্টধর্ম এক বিশেষ ধর্মীয় প্রথার প্রবর্তন করে। শরীর এবং যৌনবাসনার আদি পাপ থেকে মুক্তি পাবার এই প্রক্রিয়াটির নাম 'কনফেসন'। এটি ব্যক্তিমানুষের যৌন আচরণের উপর ধর্মীয় খবরদারিকে চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা দেবারই একটি সুচতুর কৌশলমাত্র। যৌননৈতিক অপরাধ হিসেবে সঙ্গমের ভঙ্গি, যৌনতাকালে নারী-পুরুষের শারীরিক অবস্থান, সমকামিতা, আত্মরতি—এই সবকিছুই পুরোহিতের কাছে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে স্বীকার করতে হত। এভাবেই খ্রিস্টধর্মের চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা থেকে আধুনিক যুগের সূচনা পর্যন্ত ব্যক্তিজীবনে রতিক্রিয়ার চর্চা রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন-সাপেক্ষ হয়ে ওঠে। আলোকপর্বের যুগে পৌঁছে এই খবরদারির কর্তৃত্বে রদবদল ঘটল। চার্চের বদলে এলেন 'আধুনিক রাষ্ট্রে'র 'বৈজ্ঞানিক' প্রভুরা—ডাক্তার, মনোবিজ্ঞানী, আমলা-পুলিশ, সংবাদপত্র-সম্পাদক, বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, লেখক ও সাহিত্যিকবৃন্দ। আঠারো ও উনিশ শতক জুড়ে চলল শরীর ও যৌনতা বিষয়ক ডাক্তার-মনোবিদ্‌দের সুবিস্তৃত কর্মকান্ড, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গোটা বিষয়টাকে 'বৈজ্ঞানিক' তত্ত্বের আওতায় নিয়ে আসার চেষ্টা। এইসব উদ্যোগের পাশাপাশি 'জ্ঞান' ও 'ক্ষমতা'র যৌগপত্যে সৃষ্টি হল শরীর-যৌনতা-যৌন আচরণ-সংক্রান্ত সুস্থ-বাঞ্ছিত/অসুস্থ-অবাঞ্ছিত ধরনের অসংখ্য 'কোড'; ব্যক্তির শরীর ও শরীরী কামনার উপর সামাজিক অনুশাসনের চূড়ান্ত বৈধতা প্রতিষ্ঠিত হল।

সতেরো শতকের ধ্রুপদী যুগ থেকে আলোকপর্বের 'বৈজ্ঞানিক' দর্শন 'যুক্তি'কেই মানবপ্রগতির একমাত্র চালিকাশক্তি হিসেবে শিরোধার্য করল। একধরনের সুনির্দিষ্ট যুক্তিকাঠামোর বাইরে যাবতীয় 'অযুক্তি'কেই সে 'প্রাগাধুনিক', আলোকায়নের পরিপন্থী হিসেবে চিহ্নিত করে ঠেলে দিল এক দুর্গম অন্ধকারের ধূসর এলাকায়। এক্ষেত্রে যুক্তির স্বরাটত্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ONANIA;

OR, THE

HEINOUS SIN

OF

Self-Pollution,

AND

All its Frightful Consequences, in both SEXES, Consider'd,

WITH

Spiritual and Physical ADVICE to Those who have already Injur'd themselves by this Abominable Practice.

To which are Added,

Divers remarkable Letters from such Offenders, to the Author, lamenting their Impotencies and Diseases thereby.

AS ALSO

LETTERS from Eminent Divines, in Answer to a CASE of CONSCIENCE, relating thereto.

AS LIKEWISE

A Letter from a LADY, to the Author, [very curious] and another from a Married-Man, concerning the Use and Abuse of the Marriage Bed, with the Author's Answer. And two more from two several young Gentlemen, who would urge the necessity of SELF-POLLUTION; and another Surprizing one, from a young married Lady, who by this detestable Practice became Barren and Diseas'd.

There shall in no wise enter into the Heavenly Jerusalem, any Thing that defileth, or worketh Abomination. Rev. xxi v. 27.

The Sixth EDITION, Corrected and Enlarged.

LONDON: Printed for, and Sold by *T. Crouch*, Bookseller, at the *Bell*, over against the *Queen's-Head-Tavern*, in *Paster-Noster-Row*, near *Cheapside*. 1722. [Price 1 s. 6 d. Stitch'd.]

হস্তমৈথুন বিষয়ক প্রথম বই, লন্ডন, ১৭১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে দাঁড়াল শাসকদের এক অন্যতম হাতিয়ার। 'যুক্তি'কে এমনভাবে প্রণালীবদ্ধ করা হল, যাতে, মানবজীবনের প্রায় সবকটি দিক সম্পর্কে, মানবমন সম্পর্কে ডাক্তার-মনোবিদ্‌দের 'জ্ঞানের এষণা' আদতে সামাজিক ক্ষমতাকাঠামোকে আরও বেশি সংহত করতে পারে। যুক্তির সার্বভৌম প্রাধান্যকে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করে যে মানুষ তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার 'অন্যত্ব' আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইল, তাকেই আইনভঙ্গকারী, অসামাজিক প্রাণী হিসেবে চিহ্নিত করে ঠেলে দেওয়া হল সমাজের কিনারায়। শুধু তাই নয়,তাকে দমনের জন্য জন্ম নিল বিভিন্ন ধরনের আপাত-বৈজ্ঞানিক মনোচিকিৎসা, অপরাধবিজ্ঞান। সতেরো-আঠারো শতকের 'ধ্রুপদী যুগ' এবং আঠারো-উনিশ শতকের 'আধুনিক' যুগব্যাপী তাই 'অযুক্তি'কে ক্ষমতার সাহায্যে আয়ত্তে আনার জন্য অত্যাবশ্যকীয় পদক্ষেপ হিসেবে 'অযুক্তি'কে 'অসুস্থতা' বা 'রোগ' হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়োজন দেখা দিল।

'আধুনিক' বুর্জোয়া সাধারণতন্ত্রে সামাজিক ক্ষমতা এক নতুন প্রয়োগতন্ত্র গড়ে তোলে। ক্ষমতা নিজেকে অদৃশ্য এবং অগোচর রেখে নাগরিকের জীবনের প্রত্যেকটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে নিজের অনুপ্রবেশ ঘটায়। আলোকপ্রাপ্তি, মানবহিতৈষণার মোড়কে 'ক্ষমতার' এই সর্বাতিশায়ী, সার্বভৌম চেহারার বিশ্লেষণ করেছেন মিশেল ফুকো তার 'Discipline and Punish : The birth of the prison' বইয়ের 'Panopticanism' অধ্যায়ে। জেরেমি বেন্থাম প্রবর্তিত 'প্যানঅপটিক্যান' নামক কারাগারের নকশাটি বিশ্লেষণ করে ফুকো দেখিয়েছেন আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিক সর্বদাই 'ক্ষমতা'র এক অদৃশ্য অথচ অন্তহীন নজরদারির আওতায় বেঁচে রয়েছে। প্রাণপণ চেষ্টা করছে তথাকথিত 'স্বাভাবিক' (normal) হয়ে ওঠার, কারণ কোনও এক অসতর্ক মুহূর্তেও, 'স্বাভাবিকত্ব', 'সুস্থতা' থেকে বিচ্যুত হলেই সে চিহ্নিত হবে 'আইনভঙ্গকারী', 'অস্বাভাবিক' হিসেবে। এই ক্ষমতার চরিত্র বোঝাতে গিয়ে ফুকো বলেছেন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'Hence the major effect of Panoptican : to induce in the inmate a state of conscious and permanent visibility that assures the automatic functioning of power. So to arrange things that the surveillance is permanent in its effects... It is an important mechanism, for it automatizes and disindivisualizes power.'[২]

আধুনিক যুগে এই technology of power-ই বহুবিধ কৌশলে মানুষের যৌনজীবনকে আয়ত্তে আনতে চেয়েছে। খ্রিস্টধর্মীয় নৈতিকতা, গবেষক-মনোচিকিৎসক-মানবহিতৈষীদের দ্বারা জ্ঞান ও ক্ষমতা প্রয়োগের অবিরাম প্রচেষ্টায় আঠারো-উনিশ শতক জুড়ে ইউরোপীয় সমাজে যৌনতা সম্পর্কে গড়ে তোলা হয়েছিল কতকগুলি বিধিবদ্ধ doctrine, যার সামান্যতম এদিক ওদিক ঘটলেই তাকে বিকৃত, অন্যায় যৌনাচার হিসেবে চিহ্নিত করা সহজ হয়ে যায়। এবং যৌনতা সম্পর্কিত স্ট্যান্ডার্ড আচরণবিধিগুলোই এক জটিল প্রক্রিয়ায় ঔপনিবেশিক শক্তির হাতফেরতা হয়ে গেঁড়ে বসেছিল উপনিবেশের মাটিতে; গোটা উনিশ শতকের শেষার্ধব্যাপী শিক্ষিত, 'বাবু' বাঙালি ভদ্রলোকদের মননে।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, কাকে বলে যৌনতা? কাকেই বা বলে 'শরীর'? শরীর ও যৌনতা-বিষয়ক 'শালীন'/'অশালীন' ভেদবিভাজনই বা গড়ে ওঠে কীভাবে?

২

ফুকোর জিনিওলজিকাল ক্রিটিসিজম 'যৌনতার' সংজ্ঞাদানে আগ্রহী নয়, তা বরং খুঁজে বের করতে চায় বর্তমান সমাজে 'যৌনতা' বলতে আমরা যা বুঝি, কীভাবে নির্মিত হয়েছে তার চেহারা। অর্থাৎ 'আধুনিক' সমাজে যৌনতার ডিসকোর্স গড়ে উঠেছে যে ক্যাটেগরিগুলোকে আশ্রয় করে তাদের কৃৎকৌশল বিশ্লেষণেই আগ্রহী ফুকো। 'যৌনতা'র কোনো দেশকাল-নিরপেক্ষ সংজ্ঞা ও চরিত্র নেই। প্রাচ্যের সমাজে যুগ যুগব্যাপী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কাম শিল্পকলা'-র (ars erotica) প্রচলন থাকলেও, মধ্যযুগের পর থেকে ইউরোপে এসেছে 'যৌনতা সম্পর্কিত বিজ্ঞান' (scientia sexualis)। খ্রিস্টীয় স্বীকারোক্তি বা 'কনফেসন' থেকে এর সূচনা হলেও, 'আধুনিক' যুগে 'জ্ঞান' ও 'ক্ষমতার' যৌথ প্রয়োগে 'যৌনতা ক্রমশ বৈজ্ঞানিক ডিসকোর্সের, এমনকি, প্রশাসনিক বিষয়ে পরিণত হয়। বিশেষজ্ঞদের কাছে 'যৌনতা' নামক ধারণাটি যুক্ত হয়ে পড়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ, জনসংখ্যা, শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা/অসুস্থতা, পতিতাবৃত্তি, যৌনরোগ ও তার নিরাময়, যৌন অবদমন ইত্যাদি অসংখ্য জটিল বিষয়ের সঙ্গে। অর্থাৎ 'যৌনতা' আর কোনও নিছক প্রকৃতিদত্ত বিষয়রূপে সীমাবদ্ধ রইল না, বিবিধ সামাজিক আচরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক ডিসকোর্সের সহায়তায় ব্যক্তির 'আইডেনটিটি'র এক ধরনের নির্ধারক হয়ে উঠল তার যৌনসত্তা। যেন ব্যক্তির প্রকৃতি বিচারের একটি প্রধানতম নির্ধারক তার যৌনসত্তার চরিত্রবিচার। এভাবেই 'শরীর' এবং 'যৌনতা' হয়ে উঠল 'ব্যক্তি'র উপর 'জ্ঞান' ও 'ক্ষমতা' প্রয়োগের এক অনবদ্য ক্ষেত্র।

এপ্রসঙ্গে ফুকো সেক্স এবং সেক্সুয়ালিটির মধ্যে পার্থক্য করেছেন। সেক্স অর্থে ফুকো বোঝেন deployment of allaince বা সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার। যা মূলত পারিবারিক ও আইনি বিষয় — বিবাহের ধর্মীয় বা আইনি বাধ্যবাধকতা, জ্ঞাতি সম্পর্ক — সম্পত্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত নিয়মাবলি। বিপরীতে সেক্সুয়ালিটির ক্ষেত্রে 'যৌনতা' এই সামাজিক সম্বন্ধ বিস্তারের প্রকরণগত জাল থেকে মুক্ত। এখানে 'যৌনতা' একান্তই ব্যক্তির নিজস্ব বিষয়। ব্যক্তির মনের গহন কামনা-বাসনা, লুকোনো প্রবণতাসমূহ, গোপন ফ্যানটাসিকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে সেক্সুয়ালিটি। আধুনিক আলোকায়নের যুগে চিকিৎসাবিদ্যা ও মনস্তত্ত্ববিদ্যা ব্যক্তির এই নিজস্ব প্রবণতাগুলোকে pathologize, physiologize এবং meidcalize করে তুলল। ফলত 'শরীর' হয়ে দাঁড়াল বিজ্ঞাননির্ভর কাঁটাছেড়ার বিষযবস্তু। ফুকো দেখিয়েছেন প্রাচীন গ্রিক-রোমক সভ্যতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

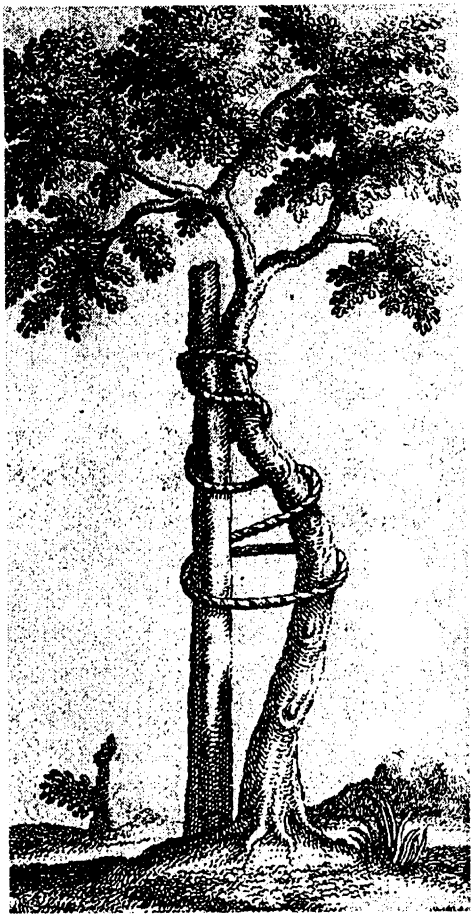

হস্তমৈথুনের কুফল, ১৭৪৯ সালের একটি ফরাসি বই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময় থেকেই পাশ্চাত্যের সমাজে যৌনতাকে ব্যক্তির চরিত্রের নির্ধারক হিসেবে বিচার করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। অনুকরণযোগ্য সুসামাজিক ব্যক্তি আত্মনিয়ন্ত্রণ, অবদমন ও কৃচ্ছ্রতার উপর জোর দিয়ে যৌনতাকে যতটা বেশি সম্ভব সংযত করবেন — এমনটাই ধরে নেওয়া হতে থাকে। 'শৃঙ্গার' বলতে যদি তিনটি মেরুকে বোঝানো হয়—ক্রিয়া, আনন্দ ও কামনা—তবে 'ক্রিয়া'কেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ করে তুলে 'যৌনতা' থেকে 'কামনা' এবং 'আনন্দ'কে বাদ দেবার ধারণা গড়ে ওঠে। যেন 'যৌনতা' একটি যান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ মাত্র—কেবল সন্তান উৎপাদনই তার একমাত্র উদ্দেশ্য। খ্রিস্টীয় শতক শুরু হবার পর থেকে এমন ধারণাই তৈরি হতে শুরু করল — অতিরিক্ত শৃঙ্গার শরীর ও আত্মার ক্ষতি করে, একগামী দাম্পত্যই একমাত্র বৈধ যৌনতার ধারক, সমকামিতা একটি ঘৃণ্য পাপ (যেহেতু তা উৎপাদনশীল যৌনতা নয়) , বীর্যসংরক্ষণের সঙ্গে চরিত্রবলের একটি সরাসরি যোগ রয়েছে (এবিষয়ে হিন্দু রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে খ্রিস্টীয় মিশনারি ভাবনার মিল আছে — উভয় ক্ষেত্রেই বালকদের শিক্ষা দেওয়া হয় — বীর্যক্ষয় একটি গর্হিত পাপ)। অর্থাৎ সুনাগরিক হয়ে ওঠার সঙ্গে যৌনতার একটি একমাত্রিক সম্পর্ক রয়েছে — এটা ক্রমশই ধরে নেওয়া হতে থাকে। সতেরো-আঠারো শতক থেকেই সন্ত ফ্রান্সিস কথিত 'হাতি-আদিকল্পে'র (Elephant Paradigm) বিস্তার ঘটতে থাকে পাশ্চাত্য সমাজে।[৩]

ফুকো দেখিয়েছেন আঠারো শতকের শেষ এবং গোটা উনিশ শতক জুড়ে 'জ্ঞান' ও 'ক্ষমতা' কয়েকটা 'স্ট্রাটেজিক ইউনিটি'কে কেন্দ্র করে ব্যক্তির মন, শরীর এবং যৌনতাকে এক অতন্দ্র নজরদারির ঘেরাটোপে বন্দী করে ফেলতে চাইল। এর মধ্যে কয়েকটি আমাদের আলোচনায় জরুরি:

১. শিশুর যৌনমনস্তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করা

২. সন্তানের জন্মদান বিষয়ে ও যৌনতা সম্বন্ধে স্বামী-স্ত্রীকে শিক্ষিত করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. যৌনবিকারকে চিহ্নিত করা ও তাকে সংশোধন করা

বাবা-মা, শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে শুরু করে প্রায় সব ধরনের সামাজিক বড়োকর্তার চোখে শিশুর যৌনতা ও যৌনবোধ এক মহা অস্বস্তির বিষয়। (যে কারণে "মা আমি কোথা থেকে এলাম?" এই প্রশ্নে বিব্রত বাবা-মা বলে ওঠেন—"তোকে হাসপাতাল থেকে কিনে এনেছি।" টেলিভিশনে অ্যাডাল্ট দৃশ্য দেখছেন শিশুসমভিব্যাহারে বাবা-মা, বাবা তড়িঘড়ি চ্যানেলটা বদলে দিলেন, আবার উল্টোটাও ঘটে, বাবা আসছে দেখতে পেয়েই ছেলে বা মেয়ে ফ্যাশন টিভি থেকে সরে এল স্পোর্টস চ্যানেলে)। যাই হোক শিশুর ধাতুগত 'বিপজ্জনক' প্রবণতাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার ভয়াবহ চেষ্টা শুরু হয় এখান থেকেই। অসংখ্য উপদেশ, অনুশাসন, নিয়মাবলি, মাথার মধ্যে পাপবোধ গেঁথে দেওয়া, ঠিকভুল স্বাস্থ্যবিধি আরোপ, পারিবারিক সম্মানবোধ জাগিয়ে তোলার কলাকৌশল দ্বারা শিশুর যৌনতাকে সতর্ক পাহারায় রাখা শুরু হয়। শিশুর মন থেকে যৌনভাবনা, যৌন আচরণ বিশেষত হস্তমৈথুনকে সমূলে উপড়ে ফেলার জন্য যাবতীয় নৈতিক নির্দেশনামা জারি হতে থাকে। যে শিশু এই নিয়মাবলির সঙ্গে খাপে খাপে নিজেকে মিলিয়ে ফেলতে পারে, সে হয় 'ভালো ছেলে', আর যে তা পারে না, সে এক নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন, অন্ধকার পাপবোধের ভিতর তলিয়ে যায় ক্রমশ। এভাবেই শিশুর শরীর এবং যৌনতা, বিশেষত বালকের হস্তমৈথুন প্রবণতার উপর সামাজিক 'ক্ষমতা' প্যাথলজিক্যাল অবদমন চাপিয়ে দেয়। 'ক্ষমতা' এখানে বহুগুণিতক হারে নিজের কার্যকারিতা বাড়িয়ে চলে প্রতিদিন।

বাবা-মার শারীরিক সঙ্গমের ফলে জন্ম নিল যে শিশু, সে-ই হবে 'জাতি-রাষ্ট্রে'র ভবিষ্যৎ নাগরিক। তাই শিশুর জন্মদান সংক্রান্ত অজস্র ম্যানুয়াল লেখা হতে লাগল বাবা-মার যৌন আচরণকে একটা বিশেষ খাতে বইয়ে দেবার জন্য। রাষ্ট্রের নজর কেন্দ্রীভূত হল বাবা-মার যৌনক্রিয়ায়। রাষ্ট্র তাঁদের উপর দায়িত্ব চাপাল—তাঁরা যেন নীরোগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরীরের অধিকারী হন, কোনও অসতর্ক 'বিকৃত' যৌনাচারের ফলে অযাচিত রোগ ডেকে না আনেন নিজেদের শরীরে, কারণ সেক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ভবিষ্যতের নাগরিক — তাঁদের সন্তান। সেই সঙ্গে 'নেশন স্টেট'কে শক্তিশালী করার জন্য জনসংখ্যার উপরেও নিয়ন্ত্রণ আরোপ প্রয়োজন। তাই দাওয়াই বাতলানো হল—বাবা-মার যৌনক্রিয়াকে সীমিত রাখতে হবে, কারণ 'অবাঞ্ছিত' বাড়তি সংখ্যক সন্তান সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের পক্ষে বোঝাস্বরূপ।

এছাড়াও তথাকথিত 'সুস্থ' যৌনতার বিপরীতে চিহ্নিত করা হল অসংখ্য যৌনবিকারকে। এবং সেগুলিকে মনস্তাত্ত্বিক 'রোগ' হিসেবে প্রণালীবদ্ধ করা হল। যাবতীয় ব্যতিক্রমী যৌন অভ্যাসের উপর দেগে দেওয়া হল বিকৃতির শিলমোহর। মনস্তত্ত্ববিদ ভাবতে শুরু করলেন, যেহেতু একজন 'বিকৃতকামী' মানুষের যৌনতা তার জীবনের সবকটি দিককেই প্রভাবিত করে, সুতরাং ব্যক্তি ও সমাজের সামগ্রিক মঙ্গলের জন্য সবধরনের যৌনবিকৃতির diagnosis প্রয়োজন, যাতে বিকৃতকামীর উপর আরোগ্যের মেডিক্যাল পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়। এভাবেই তথাকথিত রোগগ্রস্তকে রোগমুক্ত করে তোলার কলাকৌশল ব্যক্তির উপর সামাজিক ক্ষমতা প্রয়োগের একটি উপায় হয়ে দাঁড়ায়। আসলে গোটা উনিশ শতক জুড়েই ইউরোপের বুর্জোয়া সমাজে শুরু হল এমন কিছু যৌনাচার যা প্রথাসিদ্ধ সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কৃত যৌনক্রিয়া নয়। মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের চোখে এগুলিই 'বিকার' বা 'পারভারসান' হিসেবে চিহ্নিত হল।

ক্রমশ ভিক্টোরিয়ান যুগে যৌনতা পর্যবসিত হল এক নিতান্ত প্রয়োজনীয়, কিন্তু নোংরা কার্যকলাপে। যেন যৌনতার ভিতর কামনা আনন্দ রোমাঞ্চ কোনকিছুই নেই। আছে কেবল এর কার্যকর দিকটুকু, অর্থাৎ সন্তান উৎপাদন। যৌনতা সম্পর্কে এক সার্বিক নৈঃশব্দ্য ছড়িয়ে পড়ল শিষ্ট সমাজে। যৌনতার নিঃসংকোচ উল্লেখ, যৌনতাবিষয়ক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথাবার্তা 'অশালীন' বলে গণ্য হতে শুরু করল। খোদ ইংল্যান্ডের সমাজে শরীর-যৌনতা-অশালীনতা সংক্রান্ত এই নব্য উদ্ভূত নৈতিক মাপকাঠি তৈরি হবার পিছনে কয়েকটা কারণ ছিল। শিল্পবিপ্লবের ফলে যে নতুন বুর্জোয়া শ্রেণি তৈরি হল সেখানে, তারা নিজেদের ভুঁইফোড় চরিত্র ঢেকে রাখার জন্য বিভিন্ন কৃত্রিম এটিকেটের জন্ম দিয়েছিল। নিম্নশ্রেণির জনসাধারণের চেয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও পৃথগত্ব জাহির করার প্রয়োজনে তারা শরীর, যৌনতা, শরীরের অংশবিশেষ ঢেকে রাখা, শরীর সংক্রান্ত কথাবার্তার নিয়ন্ত্রণ, শারীরিক উচ্ছলতারোধ— ইত্যাদি বহুবিধ অবশ্যমান্য নিয়মকানুন তৈরি করল। এই আচরণবিধিকে ধর্মীয় ভিত্তি দান করল তৎকালীন গোঁড়া নীতিবাগীশ খ্রিস্টীয় ইভ্যানজেলিস্ট সম্প্রদায়। এরা শরীর-যৌনতা সংক্রান্ত চারিত্রিক শুদ্ধাচারকেই একমাত্র মান্য আদর্শরূপে খাড়া করেছিল। টেবিল চেয়ারের খুঁটিকে 'পা' বলে উল্লেখ করাও ছিল এদের চোখে 'অশালীন' ব্যাপার। ১৮০২ সালে ইংল্যান্ডে Society for the Suppression of Vice নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এরা জনসাধারণের ভিতর প্রচলিত যাবতীয় প্রকাশ্য নৃত্যগীতের উৎসবকেই 'অশালীন' আখ্যা দেয়। এরপর ১৮১৮ সাল Thomas Bowdler নামক এক ব্যক্তি শেক্সপিয়রের নাটক থেকে শরীর সম্বন্ধীয় 'অশ্লীল' অংশগুলি সম্পাদনা করে সম্পূর্ণ ভদ্র সংস্করণ প্রকাশ করেন, যাতে, নব্য উদ্ভূত বুর্জোয়া নীতিবাগীশতায় আঘাত না লাগে। এভাবেই বিবিধ সামাজিক প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে শরীর-যৌনতা প্রভৃতি বিষয়গুলোর অবাধ, মুক্ত বহিঃপ্রকাশের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত হচ্ছিল ও তা মান্যতাও পাচ্ছিল।

৩

১৮২৯ সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীদাসী মহাভারতের পরিমার্জিত সংস্করণ সম্পাদনা করেছিলেন। ঐ বছর, ৩০ মে তারিখের সমাচার দর্পণ-এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলা হয়েছে, কৃত্তিবাসের প্রচলিত রামায়ণে 'লিপিকর প্রমাদে ও শিক্ষক ও গায়কদিগের ভ্রমপ্রযুক্ত অনেক ২ স্থানে বর্ণচ্যুতি ও পয়ারভঙ্গ ও পয়ারলুপ্ত ইত্যাদি নানা দোষ হইয়াছে।'[৪] তাই এই পরিমার্জনা। আদতে, টেক্সট-এর পরিবর্তন করার সময় বহুক্ষেত্রেই তথাকথিত 'অশালীন' অংশও বর্জন করা হয়েছিল। এটি নিছক কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। উনিশ শতকের গোড়া থেকেই ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ যতই এদেশে দৃঢ়মূল হয়েছে, ততই এদেশীয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণ মানুষের চৈতন্যে এক গুণগত রূপান্তর ঘটে গিয়েছে। কারণ, উপনিবেশবাদ তার কলোনিগুলিতে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামরিক আধিপত্য গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গেই উপনিবেশের প্রজার চৈতন্যকে চিরস্থায়ীভাবে দখল করতে চায়। উনিশ শতকে এই দখলদারির ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল পাশ্চাত্যের রেনেসাঁস-আলোকপর্ব-উদ্ভূত 'যুক্তি' ও 'জ্ঞানে'র মেলবন্ধন, যা ইংরেজি শিক্ষা, আইন আদালত, সমাজসংস্কার, দার্শনিক-রাজনৈতিক প্রভাব ইত্যাদির মধ্য দিয়ে গড়ে তুলেছিল এক বিরাট শক্তিশালী এবং সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ঔপনিবেশিক ক্ষমতাতন্ত্র। এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েই এদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তাদের নিজের দেশের দীর্ঘকাললালিত জ্ঞানের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের জ্ঞানকাঠামোকে শিরোধার্য করে নিলেন। মানবজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে যে ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়, সেই সবকটি অভিজ্ঞতাকেই তাঁরা পাশ্চাত্য জ্ঞান ও ক্ষমতাকাঠামোর চোখ দিয়ে দেখতে শিখছিলেন। অথচ প্রাচ্যের জ্ঞান ঐতিহ্য যে পৃথগত্বকে ধারণ করে, তার প্রভাব ও পিছুটান থেকেও পুরোপুরি মুক্ত হতে পারছিলেন না তাঁরা। ফলে, জন্ম নিচ্ছিল এক অনিবার্য দ্বন্দ্ব। কলোনির শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' প্রজার চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্বের আলোয়। আশিস নন্দী বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—

> 'This colonialism colonizes minds in addition to bodies and it releases forces within the colonized soci-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

eties to alter their cultural priorities once for all. In the process. It helps generalize the concept of the modern west from a geographical and temporal entity to a psychological category. The west is now everywhere, within the west and outside, in structures and in mind.'[৫]

শরীর-যৌনতা-অশালীনতা—সবকটি ক্ষেত্রেই, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাঙালি শিষ্ট সমাজে ঔপনিবেশিক প্রভাব ক্রমশই প্রকট হয়। ফলে, ভিক্টোরীয় গোঁড়ামি ও নীতিবাগীশতার প্রভাবে শরীর-যৌনতা সংক্রান্ত যেকোনও খোলামেলা উচ্চারণই 'অশালীন' বলে বিবেচিত হতে থাকে। ফলত, শরীর ও যৌনতা এক শীতল, অন্ধকার নৈঃশব্দ্যের আড়ালে গা ঢাকা দেয়। যদিও বাংলার সমাজে এক রক্ষণশীল উচ্চবর্ণীয় অংশ সর্বদাই ছিল যারা শরীর ও যৌনতা বিষয়ে কঠোর অনুশাসন জারি করে রেখেছিল বহুযুগ ধরে। কিন্তু 'চর্যাপদ' থেকে শুরু করে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' পর্যন্ত প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগের প্রায় সমস্ত টেক্সট পড়লেই আমরা বুঝতে পারি বাংলার বৃহত্তর লোকসমাজে উচ্চবর্ণ নিয়ন্ত্রিত যৌনতা বিষয়ক 'ট্যাবু'কে অগ্রাহ্য করে বারবার বিদ্রোহ করেছে অবরুদ্ধ শরীর। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলী, শিবায়ন, আরাকান রাজসভার সাহিত্য, ময়মনসিংহ গীতিকা—সর্বত্রই নারী-পুরুষের শারীরিক আসঙ্গলিপ্সার প্রকাশ্য উল্লেখ রয়েছে। এই রচনাগুলি আসরসাহিত্য হিসেবে সর্বসমক্ষে পঠিত হত এবং লোকসমাজের দ্বারা সমাদৃতও হত। বাংলার লোকায়ত জনসমাজ তার সাহিত্য, জীবনবোধ, প্রাত্যহিক কথা বলার ভাষায় শরীর ও যৌনতা বিষয়ক উল্লেখ করতে কুণ্ঠিত হতেন না। বিশেষত বাংলার লোকসংস্কৃতিতে প্রবাদ, ছড়া, খেউড় গান প্রভৃতির মধ্যে শরীর ও যৌনাঙ্গের অবাধ উল্লেখ থেকে বোঝা যায় এর পিছনে সামাজিক অনুমোদন ছিল। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম নিয়ে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য যেমন রচিত হয়েছে, তেমনই লোকায়ত সাহিত্যে তাদের আশ্রয় করেই কথা বলেছে রক্তমাংসের শরীর। বস্তুত চড়ক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাজন, খেউড় প্রভৃতি উৎসবে লোকায়ত জনসমাজের মানুষজন শরীরকেন্দ্রিক বলগাহীন উদ্দামতার মধ্য দিয়ে তাদের উপর চেপে বসে থাকা উচ্চবর্ণীর সমাজের আধিপত্য ও ক্ষমতার পাষাণভারকে কয়েকমুহূর্তের জন্য হলেও অগ্রাহ্য করতে পারে। লোকায়ত উৎসবকেন্দ্রিক এই হইহুল্লোড়-আমোদপ্রমোদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন বাখতিন, তাঁর 'কার্নিভাল তত্ত্বে'। তিনি দেখিয়েছেন স্বতঃস্ফূর্ত লোক উৎসবগুলোর মধ্য দিয়ে জনগণ যখন তাঁদের প্রতিদিনের নিপীড়িত জীবন থেকে সাময়িকভাবে হলেও মুক্তি খোঁজে, তখন পার্থিব শরীরই হয়ে ওঠে তাদের মুক্তির সবচেয়ে বড়ো অবলম্বন। পেট ভরে খাওয়া দাওয়া, নারী পুরুষের শারীরিক সঙ্গম, এমনকী মল মূত্রত্যাগও তখন প্রতিদিনের বাস্তবকে অস্বীকার করার উপাদানে পরিণত হয়। আমাদের দেশীয় অভিজ্ঞতায়, বিভিন্ন ধরনের পূজাপার্বন, লোকাচার, বিয়ের আসরে জামাইকে নিয়ে আদিরসাত্মক ঠাট্টা মস্করা, মেহনতী জনতার কায়িক শ্রমের মুহূর্তে সম্মিলিত ভাবে অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ, হোলি উৎসব— সবই বাখতিনের চিন্তার আলোয় এক নতুন অর্থ খুঁজে পায়। মধ্যযুগের ইউরোপীয় কার্নিভালগুলির ভিতর দিয়ে ফুটে ওঠা এই ধরনের প্রতিস্পর্ধী চরিত্র সম্পর্কে বাখতিন বলেছেন : 'A boundless world of humourous forms and manifestations opposed the official and serious tone of mediaval eccelasiastical and feudal culture'।[৬]

কিন্তু উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক শিক্ষা ও চৈতন্যের দ্বারা রূপান্তরিত এদেশের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণি বাংলায় যুগ যুগ ধরে প্রচলিত লোকায়ত সংস্কৃতিতে ব্যবহৃত শরীর ও যৌনতার উপাদানকে এককথায় 'অশালীন' বলে খারিজ করে দিল। ইংরেজি শিক্ষা, সমাজসংস্কার, সভাসমিতি, শিষ্টভাষা আশ্রিত সাহিত্যের মাধ্যমে মতপ্রকাশকারী এই 'ভদ্রলোক' শ্রেণি বাংলার আপামর সাবঅল্টার্ন জনতার চেতনা থেকে বহু দূরে সরে গিয়ে পুরোপুরি ঔপনিবেশিক প্রভুর দৃষ্টিকোণ থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোটা বিষয়টা দেখতে শুরু করল। এদেশে বসবাস করতে আসা ব্রিটিশ সিভিলিয়ানদের চোখে প্রাচ্যের মানুষদের চেহারা, তাদের আচার-আচরণ, অর্ধ-অনাবৃত শরীর ও পোশাক-আশাক, সাহিত্য, শিল্প, তাদের লোকউৎসব-লোকসংস্কৃতিতে শরীরকেন্দ্রিক আচরণের অবাধ বহিঃপ্রকাশ—সবকিছুই ছিল গভীর বিতৃষ্ণা ও অবজ্ঞার বিষয়। এই পিউরিটান, ইউরোপীয় দম্ভের বিকৃত দিকটিকেই আত্মস্থ করে এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজস্ব ঐতিহ্য থেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত করে নিল নিজেদের। জ্ঞানদীপ্তি ও যুক্তির আলোয় আলোকিত ইউরোপের শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা কলোনির প্রজাদের কেবল অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক শোষণ চালিয়েই ক্ষান্ত ছিল না। তারা মনে করত পশ্চাৎপদ প্রাচ্যে সিভিলাইজিং মিশন পৌঁছে দেওয়া উন্নত, সভ্য, এগিয়ে থাকা পাশ্চাত্যের একটি নৈতিক দায়, যা তারা শিক্ষা-সাহিত্য-সমাজসংস্কার আন্দোলন-চিকিৎসাবিদ্যা—খিস্টধর্ম প্রচারের দ্বারা প্রতিনিয়ত করে চলেছে। বস্তুত ইউরোপের সবচেয়ে র‍্যাডিকাল চিন্তাবিদরাও মনে করতেন 'বর্বর' প্রাচ্যকে 'সভ্য' করে তোলার জন্য ঔপনিবেশিক শাসন একটি প্রয়োজনীয় ধাপ যার দ্বারা প্রাচ্য 'সভ্য' হয়ে উঠে পাশ্চাত্যের আয়নায় নিজের মুখ দেখবে, পাশ্চাত্যের সর্বজনীন সভ্যতার মাপকাঠিতে নিজেকে সঁপে দিয়ে নিশ্চিত থাকবে সে। রেনেশাঁস-এনলাইটেনমেন্ট-দৃপ্ত পাশ্চাত্য যদি পরিণত বয়স (adulthood)-এর প্রতিনিধি হয়, অসভ্য প্রাচ্যের প্রজারা (subjects) তবে শৈশব (childhood)-এর প্রতিনিধিত্ব করছে। পাশ্চাত্য matured হলে প্রাচ্য immatured হতে বাধা। উপনিবেশের এই প্রজাদেরও আবার দুটো ভাগ। এদের মধ্যে ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' প্রজারা যেন পুরোপুরি child নয়, বরং chidlike; আর আপামর অশিক্ষিত (অতএব বর্বর) সাবঅল্টার্ন প্রজারা হল childish; প্রথমোক্তদের জয় করা যাবে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-যুক্তির মহিমা দ্বারাই, কিন্তু দ্বিতীয়োক্তরা ওইসব যুক্তি-টুক্তির ধার ধারে না, সুতরাং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের ক্ষেত্রে civilizing mission ফলপ্রসূ করে তোলার একমাত্র উপায় ঔপনিবেশিক ক্ষমতা ও শাসনতন্ত্র, সামরিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক আধিপত্য দ্বারা তাদের পরাভূত করে ফেলার হিংস্র পদ্ধতি (যেভাবে উনিশ শতক জুড়ে একের পর এক কৃষক বিদ্রোহ দমন করা হয়েছে বাংলায়)। আশিস নন্দীর মতে এই দুই পদ্ধতিতে এদেশের শিক্ষিত উচ্চবর্ণ এবং অশিক্ষিত নিম্নবর্গকে পরাভূত করে, তাদের চৈতন্যকে ইউরোপীয় জ্ঞান-যুক্তি-আলোকায়নের সর্বজনীন কাঠামোয় যুক্ত করতে চেয়েছে ঔপনিবেশিক প্রভুরা, যা তাঁর ভাষার 'Partnership in the liberal utiliterian or radical utopia within one fully homogenized cultural political and economic world.'[৭]

কাজেই, কলোনির শিক্ষিত 'জ্ঞানান্বেষী' ভদ্রলোক প্রজা তার শ্বেতাঙ্গ প্রভুর চোখ দিয়েই দেখতে শিখল নিজের সমাজের বিরাট নিম্নবর্গীয় সমাজে প্রচলিত শরীর-যৌনতা বিষয়ক মূল্যবোধগুলোকে। কলকাতা শহরের ব্যাপকতম নীচুতলার মানুষ একত্র হত যে সব উৎসবগুলোয়, অর্থাৎ চড়ক-গাজন-সঙের মিছিল ইত্যাদি—সেগুলি নিষিদ্ধ করার জন্য বহুকাল ধরে চেষ্টা চালায় ঔপনিবেশিক প্রশাসন। এই বিরাট উৎসবগুলোয় (চড়ক ও গাজনে) বিপুল সংখ্যক আনপড় সশস্ত্র জনগণের সমাবেশ ঘটত, এটা যেমন একটা বড় কারণ, তেমনই আর একটা কারণও চিল এই উৎসবগুলোয় খেটে খাওয়া মানুষের খোলামেলা শরীর প্রদর্শন, যৌনতাব্যঞ্জক গান-বাজনা রীতিমত অশালীনতা ও অস্বস্তিকর শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে উঠেছিল তাঁদের চোখে। অনেকটা একইভাবে শিক্ষিত বাঙালি 'ভদ্রলোক'ও সর্বত্রই দেখতে লাগল 'অশালীনতা'র ভূত। ইংরেজ শিক্ষাবিদ ও খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকদের সঙ্গে জোট বেঁধে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের উপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠল তারা :

১. বটতলায় ছাপা অসংখ্য সস্তা বইপত্র, যার মধ্যে রামায়ণ মহাভারত জাতীয় পৌরাণিক সাহিত্যের অপরিশীলিত সংস্করণের সঙ্গে সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বিদ্যাসুন্দর' জাতীয় প্রেমোপাখ্যান, আরবি-ফারসি-হিন্দুস্তানি থেকে নেওয়া কিস্‌সা সাহিত্য ও শরীরী বর্ণনামূলক কামসাহিত্য। সমসাময়িক ইংরেজি ও কিছু ক্ষেত্রে বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রগুলোও এদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল।

২. এদেশীয়দের পোশাক-আশাক, বিশেষত মহিলাদের স্বল্প আবরণ ব্যবহারের অভ্যেস, দৈহিক প্রণয়সংক্রান্ত অভিব্যক্তি, অন্তঃপুরের মহিলাদের ভিতর প্রচলিত সমৃদ্ধ মেয়েলি ছড়া-প্রবাদের ভান্ডার, সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি, তাদের নিজস্ব কথনভঙ্গি, মহিলাদের কোন্দলপ্রিয়তা, মেয়েলি অভিজ্ঞতার নিজস্বতা—সবই নব্য শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোকের বিরোধিতার সম্মুখীন হল।

৩. যাত্রা, পাঁচালি, কবিগানের লড়াই, খেউড়, ঝুমুর, আখড়াই-হাফ আখড়াই ইত্যাদি লৌকিক নাচগানের অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক প্রশাসন ও শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' সমাজ সরব হতে থাকে।

৪. কলকাতা শহর জুড়ে ক্রমশ বাড়তে থাকা বেশ্যাবৃত্তি, জমিদার সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষণায় তাদের অবস্থান, উপর-নীচ সকল শ্রেণির মানুষের কাছে বারাঙ্গনাপল্লীর আকর্ষণ, এমনকি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটা বড়ো অংশেরও বেশ্যাসক্তি ইংরেজ প্রশাসক ও 'ভদ্রলোক' সম্প্রদায়ের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই সংক্রান্ত টানাপোড়েনের অসংখ্য ছবি দেখতে পাওয়া যায় সমগ্র উনিশ শতকের সাহিত্যে।

পাদ্রি জেমস লং ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত তাঁর A Descriptive Catalouge of Bengali Works বইতে তৎকালীন কবিগান- পাঁচালি-যাত্রা সম্পর্কে অত্যন্ত বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—

'The Yatras are a species of Dramatic Action, filthy, in the same style with the exhibition of Punch and Judy or of the Penny Theatres in London, treating of licentiousnes or of the amours of Krishna.'[৮] আর কবিগান সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য 'They are filthy and polluting' এমনকি বটতলা থেকে প্রকাশিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কামশাস্ত্র, প্রেমবিলাস, সম্ভোগরত্নাকর, রসমঞ্জরী, শৃঙ্গারতিলক প্রভৃতি বই সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য These works are beastly, equal to the worst of the French School.

প্রাগাধুনিক যুগের বাঙালি মহিলাদের মধ্যে অন্তর্বাস পরার তেমন চল ছিল না, কিন্তু ঔপনিবেশিক প্রভাবে শিক্ষিত বাঙালি, অন্তঃপুরিকাদের অনাবৃত দেহাংশের ভিতরেও শরীর-কেন্দ্রিক অশালীনতা খুঁজে পেল। ১৬ জুন ১৮৫১ 'সংবাদপূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রিকায় এহেন অভিযোগ করা হয় :

> 'সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহারে সবস্ত্র-বিবস্ত্র প্রভেদ থাকে না, শরীরাচ্ছাদন জন্য বস্ত্র ব্যবহার করিতে হয়, যে বস্ত্র পরিধান করিলে সর্ব্বাঙ্গ দেখা যায় বস্ত্র পরিধানে প্রয়োজন কি, ইংরেজদিগের মধ্যে সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহারের প্রচলন প্রায় নেই, যবন জাতীয়েরাও সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহার করে না ... সরু কাপড়ে বঙ্গদেশীয় পুরুষ-পুরুষীগণ লম্পট লম্পটী হইয়া উঠিয়াছেন। যাহারা সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করেন তাহারদিগের কি না দেখা যায়, বিশেষত স্নান করিয়া উঠিলে শরীরের সূক্ষ্ম রোম পর্যন্ত অন্য লোকের দৃষ্ট হয়, ইহা দেখিয়াও এতদ্দেশীয় মান্যবর মহাশয়গণ আপনাদিগের পরিবারাদির মধ্যে এই কুব্যবহার রাখিয়াছেন ইহাতে আমরা পূর্বাপর আক্ষেপ করিয়া আসিতেছি...'[৯]

লক্ষণীয়, সূক্ষ্মবস্ত্রের বিরোধিতা করতে গিয়ে লেখক ইংরেজদের পোশাক ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এবং পোশাক ব্যবহারের সঙ্গে নরনারীর স্বাভাবিক যৌনসাহচর্য-সংসর্গ ও যৌনশিথিলতাকেও যুক্ত করা হচ্ছে এখানে। ১ আগস্ট ১৮৩৫ 'সমাচার দর্পন'-এ প্রকাশিত একটি লেখায় কলকাতার নাগরিক অভিজাত মহিলাদের গোটা শরীর ঢাকা থাকে, এমন পোশাক পরার সপক্ষে ওকালতি করা হচ্ছে এই যুক্তিতে যে,

> 'কলিকাতাস্থ স্ত্রীগণ যাদৃশ পরিচ্ছদ ভূষণ ব্যবহার করেন, তদ্রূপই ইতস্তত সর্বত্র প্রচলিত হয়।'[১০]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

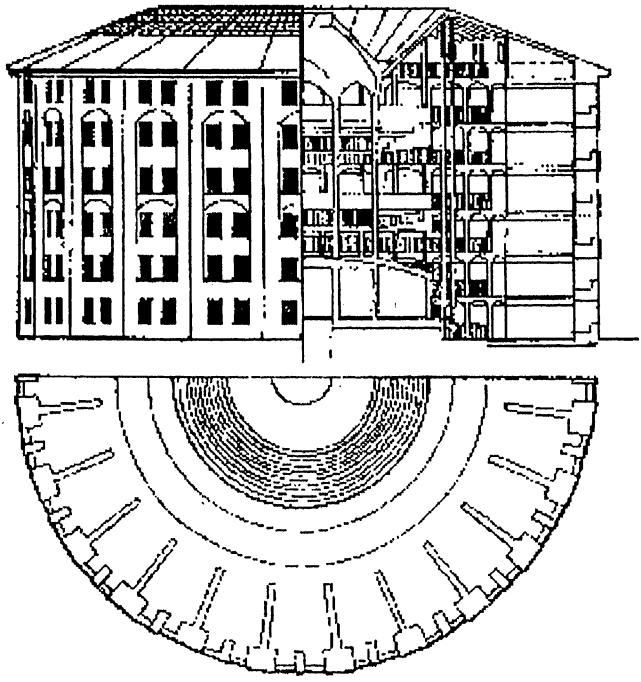

ম্যান অপটিক্যান-এর নকশা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থাৎ পোশাক আশাকের বিষয়েও বাদবাকি বাংলার উপর কলকাতার আধিপত্য স্বীকৃত হচ্ছে এখানে। নগরকেন্দ্রিক ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির পক্ষে এ যেন এক স্পষ্ট সওয়াল। এমনকী পরবর্তী সময়েও 'রহস্য সন্দর্ভ' পত্রিকার ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত একটি লেখায় বলা হয় 'সূক্ষ্ম সিমলে ও শান্তিপুরে কাপড় ব্যবহারের কারণে বিদেশীয়দের নিকট বাঙালিরা যে কি পর্যন্ত হেয় হইতেছেন তাহার পূর্ণ বর্ণন করা দুষ্কর।' এমনকি 'ইহাতে বীর্যের হানি ও লাম্পট্যের বৃদ্ধিও ঘটিতেছে কিন্তু কুপ্রথা এমনই বলবতী যে তাহার নিবারণ দূরে থাকুক পশ্চিম প্রদেশী হিন্দুস্তানিরা কিয়ৎকাল এতদ্দেশে থাকিলে ইহার অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়।'[১১]

১৯ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই 'গণসংস্কৃতি' হিসেবে শরীর-যৌনতা সংক্রান্ত যেকোনো 'অশালীন' প্রদর্শনের বিরুদ্ধে আইনি বিধিনিষেধ জারি হতে থাকে। ইংরেজ প্রশাসন ১৮৫৬-এর জানুয়ারি মাসে একটি কঠোর আইন জারির মাধ্যমে 'কুৎসিত ছবি ও শৃঙ্গার রস সম্বলিত বইপত্র' ছাপা দন্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করে। ১৮৫৭ সালে খোদ ইংল্যান্ডে Obscene Publications Act নামে একটি প্রকাশ্য অশালীনতা বিরোধী আইন তৈরি হয়। খ্রিস্টান ধর্মযাজক জেমস লং অশ্লীলতা বিরোধী যে আন্দোলনের সূচনা করে যান, ক্রমশ সেই পথেই কলকাতার শিক্ষিত দেশীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা 'জনসাধারণের নৈতিক শুদ্ধতা রক্ষা'র জন্য ইংরেজ সরকারের লাগু করা আইনগুলি প্রণয়নে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। ১৮৭৩ সালে এঁরা প্রতিষ্ঠা করেন 'Society for the supression of Public Obscenity'। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। পূর্ব প্রচলিত যাত্রা-পাঁচালি-হাফ আখড়াই প্রভৃতি নাচগানের অনুষ্ঠান যখন প্রশাসনিক তৎপরতায় ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে পড়ছিল, তখন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ও এগুলির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য জেহাদ ঘোষণা করে। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বঙ্গদেশে নাট্যকাব্যের অভ্যুদয় এক বিশেষ ঘটনা। তৎপূর্বে যাত্রা, কবি, হাফআকড়াই প্রভৃতি লোকের আমোদপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার একমাত্র উপায় ছিল। অধিকাংশ স্থলে এই যাত্রা, কবি, হাফআকড়াই অভদ্র অশ্লীল বিষয়ে পূর্ণ থাকিত। ইংরাজী শিক্ষা যেমন দেশমধ্যে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে এই সকলের প্রতি শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের বিতৃষ্ণা জন্মিতে লাগিল। অনেকে যাত্রা কবি প্রভৃতিতে উপস্থিত থাকিতে লজ্জাবোধ করিতে লাগিলেন।'[১২]

বাংলা রঙ্গমঞ্চে বেশ্যাদের অভিনয় করা নিয়েও তৎকালীন শিক্ষিত সম্প্রদায় রীতিমতো আলোড়িত হয়ে ওঠে। উনিশ শতকের শুরু থেকেই কলকাতায় নব্য বড়লোক শ্রেণির ব্যক্তিরা অন্যান্য ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে বেশ্যালয় নির্মাণের ব্যবসাও শুরু করেন। সে যুগের অনেক স্বনামধন্য অভিজাত ব্যক্তিও এই ব্যবসায় প্রকাশ্যে বা গোপনে যুক্ত ছিলেন। সমাজের প্রায় সর্বস্তরের মানুষই বেশ্যাসঙ্গ করতেন। হয়তো তার একটাই করাণ ছিল এই যে, গৃহস্থঘরের চৌহদ্দিতে যৌনতার অবাধ পরিতৃপ্তি ঘটানোর কোনও উপায়ই সেদিন তাদের ছিল না। অবশ্য অনেকেই সামাজিক প্রতিপত্তি বজায় রাখার উপায় হিসেবেও রক্ষিতা পুষতেন। কিন্তু এদের অনেকেই বেশ্যাসংসর্গ, যৌন আচরণ সম্পর্কে প্রকাশ্য জীবনে একধরনের ডাবল স্টান্ডার্ড রক্ষা করে চলতেন, ঠিক যেমনভাবে 'সুরাপান নিবারণী সভা'র অনেক সভ্যই লুকিয়ে চুরিয়ে মদ্যপান করতেন (প্যারীচরণ সরকারের উদ্যোগে এই সভার প্রতিষ্ঠা ২৪শে মে ১৮৬৪) । দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নাটকে এই ডাব্‌ল স্ট্যান্ডার্ডের কয়েকটি চমৎকার উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজের সভ্য অর্ধশিক্ষিত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কেনারাম নিমচাঁদ দত্তকে জানায় সে বেশ্যাসংসর্গ করে না, অথচ উপস্থিত গণিকা কাঞ্চন সাক্ষ্য দেয় তার বেশ্যাগমনের—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিপু-বিহার।

মহৎ ধর্ম্ম বঙ্গবাসী লও উপাদান। প্রয়াসে প্রসূন-মালা করেছি রচন॥

শ্রীমহিমাচন্দ্র-চক্রবর্ত্তি-প্রণীত।

ফির না নূতন খনি, নিরখি অন্তরে।
দেখ'ই না একবার, কি আছে ভিতরে॥

"কবিতারসমাধুর্য্যং কবির্বেত্তি ন তৎকবিঃ।
ভবানী-ভ্রূকুটীভঙ্গীর্জ্জরো বোত্তি ন ভূধরঃ॥"

"স শ্লোকঃ শ্লোকতাং যাতি যো বিদাং পঠ্যতেঽন্তঃ।
অবিজ্ঞাতরি বিজ্ঞাতে লোনো ভবতি কেবলম্॥"

প্রথম কাব্য।

কলিকাতা
সিমুলিয়া-হেদুয়া-দীঘীর পূর্ব্ব হরিপালের লেন ৭ নং ভবনে
কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে
শ্রীকালীকুমার চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
১২৭৮ সাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'নকুলেশ্বর। আপনার বেশ্যালয়ে গতিবিধি আছে?

নিমচাঁদ। প্রেজুডিস নাই।

কেনারাম। আমি কখন বেশ্যালয়ে যাই না, ওতে পাপ হয়।

কাঞ্চন। আমার বাড়িতে একদিন গ্যাছলেন।

কেনারাম। আমি তখনি উঠে এচ্‌লেম।

কাঞ্চন। উঠে এচ্‌লে, না ইচ্ছে তাড়য়ে দিয়েচিল।

নিমচাঁদ। বাহবা ঘটিরাম—বাবা ডুব দিয়ে জল খেলে গলায় বাঁধে।

নকুলেশ্বর। সত্যি সত্যি গিয়েছিলে?

কাঞ্চন। এই আরদালি ব্যাটাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিচ্‌লেন—আমি ভাই বসে রইচি, আরদালি সঙ্গে করে এই মূর্তি এসে উপস্থিত, সেদিন আরদালি খুড়ো ইঁটের গুঁড়ো দিয়ে ঘষে ঘসে চাপরাসখানি ফরসা করে এনেছিলেন। আমার দাসী জিজ্ঞাসা কল্যে, "কি চাওগো?" আরদালি খুড়ো অমনি গোঁপে চাড়া দিয়ে বল্যেন 'ইনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, এইখানে আজ থাকবেন।" ইচ্ছে হাঁসতে হাঁসতে শামলার উপর হুঁকোর জল ঢেলে দিলে, বাবু ভিজে বাঁদরের মত আস্তে আস্তে উঠে গেলেন।'[১৩]

হাস্যস্পদ কেনারাম ডেপুটির মধ্য দিয়ে গোটা উনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের চেতনার স্ববিরোধ প্রকট হয়ে পড়ে। কেশবচন্দ্র সেনের পত্রিকা 'সুলভ সমাচার' সেদিন পাবলিক থিয়েটারে বেশ্যাদের দিয়ে অভিনয় করানোর বিরুদ্ধে প্রায় যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। ১৫ এপ্রিল ১৮৭৩ এই কাগজে প্রকাশিত একটি লেখায় বলা হয়।

'মেয়ে নটী আনিতে গেলে মন্দ স্ত্রীলোক আনিতেই হইবে, সুতরাং তাহা হইলে শ্রাদ্ধ অনেকদূর গড়াইবে। কিন্তু দেশের পক্ষে তাহা মহা অনিষ্টের হেতু হইবে। ভদ্রলোকের ছেলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইয়া এরূপ জঘন্য ইচ্ছা মনে স্থান দেন ইহাই আশ্চর্যের বিষয়।'[১৪]

এই পত্রিকায় প্রকাশিত 'থিএটর ও কুচরিত্র নারী' নামক আলোচনায় মন্তব্য করা হয় স্কুলের ছেলেরা থিয়েটারে গিয়ে অধঃপাতে যাচ্ছে এবং বলা হয়।

'পাঠকদিগের প্রতি আমাদের এই নিবেদন যেন যে সমস্ত থিয়েটারে স্ত্রী অভিনেতা আছে সেখানে না গমন করেন, গেলে পরে ভাল মন লইয়া ফিরিয়া আসা তাহাদের পক্ষে কঠিন হইবে।'[১৫]

অর্থাৎ থিয়েটারে বেশ্যাদের অভিনয় দেখতে যাওয়ার সঙ্গে 'ব্যক্তি'র চরিত্রও আইডেনটিফায়েড হয়ে যাচ্ছে 'সুচরিত্র' ও 'কুচরিত্র'—এই দুইভাগে। সাধারণ দর্শকসমাজ যখন মঞ্চে বারাঙ্গনাদের হাস্য লাস্য নাচ-গান-অভিনয়ে ভিড় জমিয়ে আনন্দ উপভোগ করছে, ফুলের মালা ছুঁড়ে দিচ্ছে, তখন ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায় গোঁড়া নীতিবাগীশতার প্রভাবে তার বিরোধিতা করছে। রঙ্গমঞ্চের প্রকাশ্য পরিসরে সেদিন ক্ষণিকের জন্য হলেও মুক্তি পেয়েছিল অবরুদ্ধ সামাজিক 'শরীর'। কিন্তু ঔপনিবেশিক যুক্তিকাঠামো সন্দেহের চোখে দেখতে শেখাল দেশীয় নিম্নবর্গের সেই বন্ধনহীন উল্লাসকে। একদা কীর্তন, কবিগান, খেউড়, হাফ আখড়াই এ বেশ্যাদের প্রকাশ্য অংশগ্রহণকে আক্রমণ করেছিল এই শিক্ষিত সমাজ। আজ তাদের সেই নৈতিক 'যৌন' কাতরতা ও কুণ্ঠা নতুন মোড়কে ফিরে এল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সামনে বেশ্যাদের প্রকাশ্যে অভিনয় করতে দেখে। সমসাময়িক একটি পত্রিকা মন্তব্য করল 'ভদ্রসন্তানেরা আপনাদিগের মর্যাদা আপনারা রক্ষা করেন ইহাই বাঞ্ছনীয়।'[১৬]

১৮৭২ সালে ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে 'তিন আইন' নামক বিবাহবিধি প্রচলিত হয়। কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন উদ্যোক্তা। এই বিধিতে অসবর্ণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবাহের স্বীকৃতি এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে পাত্র-পাত্রীর বিবাহের বয়স যথাক্রমে ১৮ এবং ১৪ বছর নির্ধারিত হয়। অথচ সবার আগে এই সিভিল ম্যারেজ বিধি ভঙ্গ করলেন স্বয়ং কেশবচন্দ্র। তিনি কোচবিহারের গোঁড়া হিন্দু পরিবারের ১৬ বছর বয়সী রাজপুত্রের সঙ্গে নিজের অনূর্ধ্ব ১৪ বছরের কন্যা সুনীতির বিবাহ দিলেন। প্রতিবাদে ব্রাহ্মসমাজ ভেঙে বেরিয়ে এলেন শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়-রা। পাশ্চাত্য আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, আলোকিত যুক্তির পূজারী কেশবচন্দ্রের এই উল্টো পথে হাঁটাই বুঝিয়ে দেয় কলোনির প্রজার জীবনে পাশ্চাত্য যুক্তির কার্যকারিতা কতোটাই ভঙ্গুর। যে কেশবচন্দ্র পাবলিক জীবনের অবসিনিটি দূরীকরণে ছিলেন আজীবন সচেষ্ট, তিনিই নিজের জীবনে রক্ষণশীল এই কাজটি করলেন, নাবালিকা শিশুকন্যার বিবাহ দিয়ে। বোঝা যায় ঔপনিবেশিক আধুনিকতা চেতনায় বাহ্যিক পরিবর্তন আনলেও, তথাকথিত প্রাগাধুনিক 'অ-যুক্তি'র অভিশাপ থেকে সে মুক্তি দেয় না, এমনকি ইংরেজি শিক্ষিত প্রজাকেও।

৪

শরীর-যৌনতার প্রকাশ্য পাবলিক বহিঃপ্রকাশ ছেড়ে এবার আমরা যদি ঢুকে পড়ি একান্ত ব্যক্তিগত মানুষের নিজস্ব শরীরবোধ ও যৌনাচরণের এলাকায়, তবে দেখব ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি ফুকো-বর্ণিত 'স্ট্র্যাটেজিক ইউনিটি'গুলোকে কীভাবে কলোনির প্রজার জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা কলোনির আলোকপ্রাপ্ত প্রজাকে শিখিয়েছিল কলোনির জীবনের প্রতিটি দিককে এক বিশেষ ধরনের জ্ঞান-যুক্তির কাঠামোয় পুনর্নির্মিত করতে। কিন্তু বিষয়টা এত একমাত্রিক নয়, বরং অনেকটাই জটিল এক প্রক্রিয়াকে ধারণ করে আছে। উনিশ শতকের শেষার্ধের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ধারাবাহিক ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায় ইউরোপীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সচিত্র

গার্হস্থ্য বিজ্ঞান

অর্থাৎ

যোগ, জ্যোতিষ, শিল্প, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, সঙ্গীত, বাদ্য, রন্ধন, কারুকার্য্য, চিত্র, মুষ্টিযোগ, ম্যাজিক, ইন্দ্রজাল, প্রভৃতি মানবের আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্যবিষয় সম্বন্ধে মাসিকপত্র।

নদিয়াজেলা অন্তর্গত নকাসিপাড়া থানার পুলিষ সবইন্‌স্পেক্টর

শ্রীঅমৃতলাল বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

৩৯ নং মসজীদবাড়ীষ্ট্রীট হইতে

শ্রীপ্যারীমোহন সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

Calcutta:

Printed by K. C. Dass, at the "Osborn Printing House."
11, Bentinck Street.

মূল্য প্রতি খণ্ড ।০ ডাকমাশুল (১০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্ঞানচর্চার যুক্তিক্রম-নিয়মরীতি-মীমাংসাপদ্ধতি মাফিক লেখাগুলোকে সাজানো হলেও, কলোনির লেখকরা সবচেয়ে বেশি জোর দিচ্ছেন তাঁদের একান্ত নিজস্ব দেশীয় জ্ঞানচর্চার ঐতিহ্যের উপর। সভ্য পাশ্চাত্যের উন্নত জ্ঞানকাঠামো দেশীয় জ্ঞানচর্চার অবাহমানকালব্যাপী ধারাবাহিক তাকে 'প্রাগাধুনিক' হিসেবে চিহ্নিত করে তাকে অপসারিত করলেও, দেশীয় বুদ্ধিজীবীরা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে সমান্তরাল প্রক্রিয়ায় নিজেদের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানভান্ডারকেও এগিয়ে নিয়ে যেতে চান, নিজেদের জ্ঞানকাঠামোকে পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের আদলে সাজাতে চান, কখনও কখনও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানকাঠামোর ভিতর ঢুকে পড়ে নিজস্ব জ্ঞান-অভিজ্ঞতার সাহায্যে তার রূপান্তর ঘটান। ফলে একধরনের বর্ণসংকর জ্ঞানচর্চার উদ্ভব ঘটে। নতুন নতুন ক্যাটেগরির জন্ম হয়। আবার জাতীয়তাবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দাবি করা হতে থাকে দেশীয় জ্ঞানচর্চার উৎকর্ষ পাশ্চাত্য জ্ঞানভাণ্ডারের চেয়ে অনেক বেশি। এভাবেই পাশ্চাত্যবিজ্ঞানকে দেশীয় জ্ঞান-এর ধারায় অন্তর্ভুক্ত করে ঐতিহ্যের পরিধিকে আরও বেশি প্রসারিত করার চেষ্টা চলতে থাকে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার তুলনায় এই সময়পর্বে চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত লেখালেখির পরিমাণ ক্রমেই বাড়তে থাকে। বোঝা যায় লেখকেরা অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় এটিকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। ১৮৫১ সাল থেকে কলকাতা মেডিকেল কলেজে বাংলায় পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা পড়ানো শুরু হয়। তখনও অব্দি উচ্চবর্ণ বাঙালি সমাজে পাশ্চাত্য ডাক্তারিবিদ্যাকে খুব একটা সুনজরে দেখা হত না। কিন্তু কলেজের লাইসিন্সিয়েট এবং অ্যাপথিকারি পাঠ্যক্রম খুব তাড়াতাড়ি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ক্রমশ প্রতি বছর এতে অধিক সংখ্যক ছাত্র এসে যোগদান করতে থাকে।[১৭] এ থেকে বোঝা যায় পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে 'শরীর'-এর মেডিক্যালাইজেশন পদ্ধতিটি এদেশের বৃহত্তর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে মান্যতা পেতে শুরু করেছে। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ভিতর ৪৭২টি বাংলা চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত বই প্রকাশিত হয়। বেশ কয়েকটি চিকিৎসাশাস্ত্রের পত্র-পত্রিকা বেরোতে শুরু করে। যেমন-*চিকিৎসা সম্মিলনী* (১৮৮৫-৯৪), *গার্হস্থ্য বিজ্ঞান* (১৮৮৬), *চিকিৎসক ও সমালোচক* (১৮৯৫-৯৬), *স্বাস্থ্য* (১৮৯৮-০১), *অনুবীক্ষণ* (১৮৭৫) প্রভৃতি। এইসব পত্রপত্রিকায় লেখকদের শরীর ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ভাবনা দুটি পৃথক ধারায় প্রবাহিত হয়—

ক. জাতীয় স্বাস্থ্য বা 'সামাজিক শরীর'-এর ধারণা

খ. 'ব্যক্তিগত শরীর' বা যৌনতা ও যৌনসম্পর্ক বিষয়ক আলোচনা

বাঙালির প্রকৃতি, শরীর, যৌনতা সবই তার পরিবেশ, সংস্কৃতি ও সমাজ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাই বাঙালির জাতীয় স্বাস্থ্যরক্ষায় দেশীয় চিকিৎসাপদ্ধতির কার্যকারিতা ও যৌক্তিকতা উড়িয়ে দেওয়া যায় না

অধিকাংশ লেখকের মত ছিল এটাই। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই দেশীয় আয়ুর্বেদ চিকিৎসাপদ্ধতি ও পাশ্চাত্য চিকিৎসাপদ্ধতির মেলবন্ধনের ধারণা তৈরি হয়। এই সামঞ্জস্যবাচক চিন্তাভাবনার প্রকাশ এ সময়ে লেখা অসংখ্য প্রবন্ধে পাওয়া যায়। 'সামাজিক শরীর' ও 'ব্যক্তিগত শরীর' যেহেতু ওতপ্রোত জড়িত, তাই 'ব্যক্তিগত শরীর'কে সুস্থ রাখতে পারলে 'সামাজিক শরীর' এর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো যাবে, বাঙালির দৈহিক উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করে রয়েছে এই 'ব্যক্তিগত শরীর'-এর স্বাভাবিক বাড়বৃদ্ধি, তার চিকিৎসা ও রোগনিরাময়কে কেন্দ্র করে—এমনটাই ছিল শরীরবিদ্‌দের অভিমত।

এর ফলেই শুরু হয় শরীর যৌনতা যৌনসম্পর্ক বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার প্রচেষ্টা। উনিশ শতকের শুরু থেকেই বাংলায় অজস্র কামসাহিত্যের বইপত্র ছাপা হতে শুরু করে। জেম্‌স লং তাঁর পূর্বোল্লিখিত ক্যাটালগে এরকম কয়েকটি বইয়ের তালিকা দিয়েছেন, যেমন *আদিরস, বেশ্যারহস্য, রতিবিলাস, সম্ভোগরত্নাকর* (১৬টি চিত্র সম্বলিত), *রমণীরঞ্জন, শৃঙ্গারতিলক, রসমঞ্জরী, রসসাগর, রতিবিলাপ, রতিমঞ্জরী,*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রতিশাস্ত্র'[১৭] প্রভৃতি। সামাজিক জীবনে ও ব্যক্তিজীবনেও কামসাহিত্য পাঠ, অবসর বিনোদনকালে যৌন প্রসঙ্গের আলোচনা, বেশ্যাসংসর্গ—যৌনতাবিষয়ক সুখানুভূতির অংশ হিসেবে, কামনা তৃপ্তির উপায় হিসেবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু 'মেডিক্যালাইজেশন অব সেক্স'-এর ধারণা বিকশিত হবার ফলে শরীর-যৌনতা নতুনভাবে গঠিত হল মূলত তিনটি বিষয়কে আশ্রয় করে—'ক্ষমতা', 'জ্ঞান' ও 'সুখবোধ'। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধব্যাপী এই দৃষ্টিকোণ থেকেই অনেকগুলি সেক্স ম্যানুয়াল লেখা হয়। যেমন, অন্নদাচরণ খাস্তগীর-এর *'মানবজন্মতত্ত্ব, ধাত্রীবিদ্যা, নবপ্রসূত শিক্ষা ও স্ত্রী জাতির ব্যাধি সংগ্রহ'* (১৮৭৮), সূর্যনারায়ণ ঘোষ-এর *'বৈজ্ঞানিক দাম্পত্য প্রণালী* (১৮৮৪), যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-এর *'জীবনরক্ষা'* (১৮৮৭), কেদারনাথ সরকারের *'ঋতুরক্ষা'* (১৮৯২), ভারতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের *'শুশ্রূষা প্রণালী'* (১৮৯৬) ইত্যাদি। এই বইগুলি এবং পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত অসংখ্য প্রবন্ধে দেখা যায় শরীর-যৌনতা সংক্রান্ত পাশ্চাত্য নীতিবাগীশতার সঙ্গে দেশীয় ব্রাহ্মণ্য রক্ষণশীলতা ও শুচিতাবোধ যুক্ত হয়ে একধরনের চিকিৎসাশাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যৌনসম্ভোগ ও যৌনক্রিয়াকলাপকে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। যৌনতার পাশ্চাত্য উপযোগিতাবাদী (utilitarian) ব্যাখ্যাই এখানেও গৃহীত হতে থাকে। বলা হতে থাকে—যৌনতা এবং যৌনাচারের মধ্যে সুখানুভূতি বা আনন্দের কোনও ভূমিকা নেই। এর একমাত্র প্রয়োজনীয় উপযোগিতাবাদী তাৎপর্য যদি কিছু থেকে থাকে, তবে তা হল সন্তান উৎপাদন। বস্তুত সন্তান উৎপাদনকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে এসময়ের যাবতীয় যৌনসংক্রান্ত ভাবনা। যৌনতার বস্তুগত প্রয়োজনীয়তা-নিরপেক্ষ কোনও মূল্য বা তাৎপর্য যে থাকতেও পারে—এধরনের ভাবনা নির্বাসিত হয়ে যায়। এমনকি যৌনসম্ভোগজনিত কারণে একাধিক স্বাস্থ্যহানিকর বিকারের জন্ম হয়—এ হেন ধারণাও গড়ে ওঠে। এই বিকারের ধরনগুলি এরকম :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক. যৌনসম্ভোগ মূলত স্বাস্থ্যক্ষয় ঘটায়। এর ফলে মানুষ তার স্বাভাবিক প্রকৃতিদত্ত স্বাস্থ্যের অপব্যবহার ঘটায় অমিতাচার, অসংযম, ইন্দ্রিয়তৎপরতার দ্বারা।

খ. যৌনসম্ভোগের ফলে মানুষের শরীর মন-চরিত্রের স্বাভাবিক ভারসাম্য ব্যাহত হয়। ফলে যৌনতা মানুষকে 'অ্যাবনর্মালিটি'র দিকে নিয়ে যায়। অর্থাৎ যৌনসম্ভোগ একটি অস্বাভাবিক, প্রকৃতিবিরুদ্ধ ও স্বাস্থ্যহানিকর কাজ।

এই দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী যৌনক্রিয়ার ফলে শরীরে উদ্ভূত শিহরণ, কম্পন, উত্তেজনা, অবসাদও শরীরকে স্বাভাবিক অবস্থা থেকে 'বিশৃঙ্খলা'র দিকে ঠেলে দেয়। সূর্যনারায়ণ ঘোষের লেখা 'বৈজ্ঞানিক দাম্পত্য প্রণালী'তে বলা হয়েছে

'ইন্দ্রিয় সেবন মাত্রেই ক্ষতিকর। মিত হউক, অমিত হউক, কালে হউক, অকালে হউক, প্রয়োজনে হউক, অভিলাষে হউক ইন্দ্রিয়সেবনে দেহক্ষয় করিবেই করিবে। ... বস্তুত ইন্দ্রিয়সেবন প্রবৃত্তিশূন্য ব্যক্তির নিকট অতি জঘন্য কার্য।'[১৯]

এবং লেখকের মতে এই 'অতি ঘৃণার্হ ও পৈশাচিক কার্য'-ও 'ঈশ্বরপ্রদত্ত সম্মোহনী শক্তি'র দ্বারাই মানুষের ভিতর প্রবৃত্তি হিসেবে উৎপন্ন হয়েছে। তবু নিছক বংশরক্ষার জন্যই পূর্বনির্দিষ্ট কিছু নিয়মাবলি মেনে যৌনসংসর্গ করা যেতে পারে, যেমন সদাচার, বিবাহপূর্ব ব্রহ্মচর্য পালন, হস্তমৈথুনের মাধ্যমে শরীরকে ক্ষয় না করা, সুনির্দিষ্ট আহার-পান-বিশ্রাম, অপ্রয়োজনীয় অন্যায় কামাচার থেকে বিরত থাকা এবং বড়জোর ২০ মাস অন্তর একবার স্বামী-স্ত্রীর যৌনমিলনে প্রবৃত্ত হওয়াই যথেষ্ট। এমনকি যৌন সম্পর্ক যে স্বাস্থ্যহানিকর, এর সঙ্গে শারীরিক বলবীর্য সক্ষমতার যে কোনও সম্পর্ক নেই তা বোঝাতে গিয়ে সমসাময়িক একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে, যেহেতু ছিন্নমুষ্ক পুরুষেরা সবসময়ই বলিষ্ঠ ও পালোয়ান হয়, ফলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[১ম খণ্ড] শ্রাবণ ১২৮২ সাল। [১ম সংখ্যা।]

অণুবীক্ষণ।

স্বাস্থ্যরক্ষা, চিকিৎসাশাস্ত্র ও তৎসহযোগী অন্যান্য শাস্ত্রাদি বিষয়ক

মাসিক পত্রিকা।

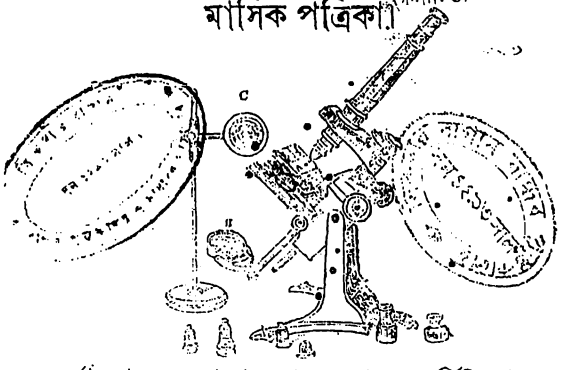

"দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্মায়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।"

"সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিগণ একাগ্র সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা দৃষ্টি করেন।"

অনুবীক্ষণ পত্রিকার নামপৃষ্ঠা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'প্রমাণ হইতেছে যে পুরুষ ও স্ত্রীদের অন্ডকোষ ও ডিম্বকোষযন্ত্র সন্তানসন্ততি উৎপাদনের জন্যই আবশ্যক, শরীরের কিছুমাত্র হিতসাধন করে না। ... উৎপাদনযন্ত্র যখন শরীরের কোনও উপকার করে না, তৎসম্বন্ধীয় ক্রিয়া বা স্ত্রী-পুরুষ সংসর্গ স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে কিছুমাত্র সাহায্য করে না...'[২৫]

এমনকি সমসাময়িক পাশ্চাত্য যৌনতার ডিসকোর্সে যেভাবে শিশু ও বালকদের মন-শরীর-যৌনাচরণের উপর নিরন্ধ্র অনুশাসনের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল, কলোনির নেটিভ শিশু-কিশোরদের উপরেও অনুরূপ নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন এদেশীয় চিকিৎসকেরা। বিশেষত সন্তানজন্মের উদ্দেশ্যবিহীন হস্তমৈথুনকে যেন-তেন-প্রকারে নির্মুল করার ঘোষিত লক্ষ্যও নিয়ে আসেন তাঁরা। ১৯ শতকের শেষদিক থেকেই বাংলায় জাতীয়তাবাদী ভাবধারা বিকশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশ ও জাতির প্রয়োজনে ধীশক্তিসম্পন্ন, ধর্মবোধযুক্ত, বীর্য-বল-বুদ্ধির আধার ভবিষ্যৎ নাগরিক সৃষ্টি করা আবশ্যক হয়ে পড়ল। তাই বালক-বালিকার চরিত্রগঠনের প্রয়োজনেই ইন্দ্রিয়সংযম ও বীর্যসংরক্ষণের নিদান ঘোষিত হল। এভাবেই উনিশ শতকের চিকিৎসাবিদ্যাসংক্রান্ত আলোচনায় পরিবার-অভিভাবক-বিদ্যালয়শিক্ষক-স্কুলকর্তৃপক্ষের দ্বারা শিশু ও বালকদের শরীর ও যৌনতা এক অন্তহীন খবরদারির আওতায় ঢুকে পড়ে। দেশীয় রক্ষণশীলতা ও পাশ্চাত্য ডিসকোর্সের সমন্বয়ে এক নতুন যৌনতাসংক্রান্ত ভাবাদর্শের চাষবাস শুরু হয়। লক্ষণীয়, আধুনিক যৌনতাবিষয়ক আলোচনায় যেমন বিপরীত লিঙ্গকামী, আত্মকামী, সমকামী, মর্ষকামী, উভকামী—প্রভৃতি লোকজনকে নিয়ে আলোচনা হয়, বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় ক্যাটেগরি দ্বারা ব্যক্তির যৌনপরিচয়কে চিহ্নিত করা হয়, এই সময়ের আলোচনায় তা করা হয়নি। এখানে যৌনতার পরিধি সীমিত কেবল স্ত্রীসংসর্গ ও প্রজননসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ ও হস্তমৈথুনের আলোচনায়। আবার উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের ভারতীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতীয়তাবাদ যেহেতু প্রাধান্যমূলকভাবে হিন্দু জাতীয়তাবাদ, তাই 'জাতীয় স্বাস্থ্যে'র বাহক হিসেবে ব্যক্তির যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে এবং যৌন অসুস্থতার কারণতত্ত্ব, বিকারতত্ত্ব, রোগের শ্রেণিবিভাজন ও রোগসংক্রান্ত আলোচনায় বারবার প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্রের ঘোষিত আচার-আচরণ, স্বাস্থ্য-তত্ত্ব, খাদ্যতত্ত্বের উল্লেখ ও প্রাচীন হিন্দুদের তুলনায় বর্তমান হিন্দুদের অধঃপতনের আশঙ্কাজনক ছবিও ধরা পড়েছে। চিকিৎসাবিদ্‌রা বর্তমানের নিরাময় খুঁজতে চেয়েছেন প্রাচীন যুগপটভূমির নিরিখে। এভাবেই ব্যক্তির যৌনতাসংক্রান্ত আলোচনায় প্রভাব ফেলেছে 'হিন্দু রিভ্যাইভালিজম্'-এর ভাবধারা।

'চিকিৎসা সম্মিলনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় '*দেশীয় স্বাস্থ্য বিজ্ঞান: অভিগমন বা স্ত্রী-পুরুষ সংসর্গ*' প্রবন্ধটি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রচলিত যৌনতার ডিসকোর্সের সবকটি ক্যাটেগরিই আলোচিত হয়েছে এখানে। এই প্রবন্ধের শুরুতেই বলা হয়েছে 'বাঙ্গালী জাতির দেহ স্বভাবতই যারপরনাই মৃদু ও ক্লেশসহিষ্ণু এবং এবং অত্যল্প লোকেরই দেহ স্বভাবতঃ বলবীর্যশালী দেখিতে পাওয়া যায়।' প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্যের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে বালক ও কিশোরদের হস্তমৈথুন প্রবণতার বিরুদ্ধে একতরফা ক্যাম্পেন, তজ্জনিত আতঙ্ক ও হতাশা। লেখক বলেছেন :

> কি সহরস্থ, কি পল্লীগ্রামস্থ, কি ইতর লোক অথবা কি ভদ্রলোক, সকল শ্রেণীর অধিকাংশ বালকের মধ্যে এই ভয়ানক কুরীতির প্রচলন থাকিলেও ইহার বিষময় পরিণাম কিন্তু ইতরলোক অপেক্ষা ভদ্র লোকের ছেলেদেরই অধিক ভোগ করিতে হয়, এই ভদ্র শ্রেণীর মধ্যে আবার যাহারা পাঠ্যাবস্থায় থাকে, তাহাদের অদৃষ্ট আরও মন্দ। ইহার বিশেষ কারণ এই যে, যাহারা প্রতিনিয়ত বিদ্যাভ্যাস বা অন্য কোন অতিরিক্ত মানসিক কার্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকেন, সাধারণের অপেক্ষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একেই তো তাঁহাদের কামপ্রবৃত্তি বা ইন্দ্রিয়শক্তি অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়া পড়ে। তাহাতে সেই অবস্থাতে যদি আবার হস্তমৈথুনাদি দ্বারা অনুত্তেজিত ও অপরিস্ফুট শুক্রকে বলপূর্বক অতিকষ্টে উত্তেজিত করিয়া শরীর হইতে প্রতিনিয়ত নির্গত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে আর কি রূপে দেহস্থ শুক্রধাতু অব্যাহত থাকিতে পারে?[২১]

লক্ষণীয়, হস্তমৈথুনের কুফল বোঝাবার জন্য অবিকল খ্রিস্টীয় কনফেশনের কায়দায় দুজন প্রত্যক্ষ ভুক্তভোগীর দীর্ঘ স্বীকারোক্তি উদ্ধৃত হয়েছে এই প্রবন্ধে। দুজনেই পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। দুজনেই এই প্রথম লোকলজ্জা, ভয় অতিক্রম করে সম্পাদককে দীর্ঘ চিঠি লিখে জানিয়েছেন তাঁদের যৌন ক্ষমতার চ্যুতি, শুক্রের ঘনত্ব হ্রাস, পুরুষাঙ্গের বক্রাকার লাভ এবং কোষ্ঠকাঠিন্য, ক্ষুধামান্দ্য ইত্যাদি আনুষঙ্গিক রোগভোগের (যেগুলো সেকালে হস্তমৈথুনের প্রত্যক্ষ ফল বলেই মনে করা হত) কথা। উভয় পত্রলেখকের বয়ানেই সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছে তীব্র অনুতাপের কণ্ঠস্বর। এছাড়াও হস্তমৈথুনের কারণে তীব্র পাপবোধ, নিঃসঙ্গতা এবং প্রতিমুহূর্তে গোটা ব্যাপারটা গোপন করার চাপ তাদের মানসিকভাবে পঙ্গু এবং প্রান্তবাসী করে দিয়েছে অনেকটাই। ধর্মযাজক, পুরোহিত বা পিতামাতা নয়, আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক সম্পাদককেই তারা দুজনেই সর্বপ্রথম জানাতে পারল নিজেদের প্রান্তিক অবস্থানের কথা। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের জ্ঞান-যুক্তির অথরিটির কাছে ব্যক্তির নিজস্বতার আত্মসমর্পণের ইতিহাসটাই আরেকবার মনে পড়ছে না কি?

কিন্তু লেখক যে বিষয়টা নিয়ে সবচেয়ে বেশি চিন্তিত, তা হল স্ত্রী পুরুষ সংসর্গ এবং তার ফলে গর্ভাধানজনিত প্রাচীন আর্য ঐতিহ্য থেকে সমকালীন বাঙালি সমাজের বিচ্যুতি। লেখক দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়েছেন :

স্ত্রী সংসর্গের উদ্দেশ্য সাধারণতঃ দ্বিবিধ কাম রিপুর চরিতার্থ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং অপত্যোৎপাদন। জ্ঞানবান মাত্রেই ইহা বেশ জানেন যে, কাম রিপুর চরিতার্থ জনিত যে সুখ, তাহা অতি ক্ষণস্থায়ী; প্রকৃতপক্ষে তাহা সুখের মধ্যেই গণ্য করা যাইতে পারে না। সুতরাং অপত্যোৎপাদনই একমাত্র প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য করা কর্তব্য। অতএব কিরূপ প্রণালীতে স্ত্রী সংসর্গ করিলে সুসন্তান উৎপন্ন হইতে পারে তাহা সাধারণের জ্ঞান থাকা উচিত। পূর্ব্বকালে আর্য্যাবর্ত্তে এ বিষয়ের সমধিক আলোচনা ছিল।[২২]

অর্থাৎ প্রাচীন আর্যরা কীভাবে, কোন্ কোন্ ঋতুতে কী পরিমাণে তিথি, বার, নক্ষত্র, শারীরিক ও মানসিক অবস্থা মেনে স্ত্রী-সংসর্গ করতেন— তার নিরিখে আজকের অধঃপতিত হিন্দুসন্তানের যৌনজীবনকে পুনর্নির্মিত করাই পত্রিকা-সম্পাদকের উদ্দেশ্য। তাই এই লেখায় *'সংস্কারতত্ত্বে গর্ভাধান'* নামে একটি পূর্বপ্রকাশিত প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ যুক্ত করা হয়েছে। এতে গর্ভাধানের গুরুত্ব হিসেবে বলা হয়েছে :

প্রাচীন আর্য্যের মতে গর্ভ হইতেই জীবের সংস্কার কার্য্যের আরম্ভ। গর্ভাধানাদি দশবিধ সংস্কারই জীবের ঐহিক ও পারত্রিকের পক্ষে একমাত্র শ্রেয় .. গর্ভকে সংস্কৃত কর — হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ ও ধার্মিক সন্তান সকল জন্মগ্রহণ করুক, তাহা হইলেই সামাজিক উন্নতি, জাতীয় উন্নতি, ধর্ম্মনীতির উন্নতি— সকল উন্নতিই আপনা আপনি হইবে।'[২৩]

এমনকি বিবাহের ক্ষেত্রেও চরম রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্যবাদী দৃষ্টিকোণকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে এবং গোটা ব্যাপারটাই ব্যাখ্যা করা হচ্ছে 'বিজ্ঞান' হিসেবে :

'সগোত্রা, সপিণ্ডা, অসবর্ণা কন্যাতে আর্য্যের দার পরিগ্রহ একেবারে নিষেধ...তাঁহারা পুত্রার্থে ভার্য্যা পরিগ্রহ বিবেচনা করেন, সুতরাং ভার্য্যা পরিগ্রহের পূর্ব্বে সুরূপ, বলবান ও গুণান্বিত পুত্রকামনায় সুক্ষেত্রের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকেন। প্রাচীন আর্য্যগণ কাম-প্রবৃত্ত হইয়া পরস্ত্রীগমন করা দূরে থাকুক, নিজ ভার্য্যাতেও অজ্ঞানে উপরত হইতেন না।...চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা ইত্যাদি যে যে পর্বকালে এবং সায়ংকালে যে ভাবে গমন করিতে নিষেধ, এই সমুদায় মানিয়া তাঁহারা স্ত্রীগমন করিয়া থাকেন।[২৪]

এছাড়াও বালক বালিকার ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য রোধে, সংযম বৃদ্ধির উপায় হিসেবে 'পুষ্টিবিজ্ঞান'-এর উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। যেসব খাদ্যগ্রহণ করলে শারীরিক পুষ্টি ঘটে অথচ অসংযমের প্রাবল্য ঘটে না, সে ধরনের সুদীর্ঘ খাদ্যতালিকা দেওয়া হয়েছে এইসব লেখায়। *'চিকিৎসা সম্মিলনী'*-তে প্রকাশিত একটি লেখায় বালিকাদের হস্তমৈথুন প্রবণতা এবং অতিমাত্রায় সম্ভোগেচ্ছার বিরুদ্ধে রীতিমতো জেহাদ ঘোষণা করা হয়েছে :

'স্ত্রীলোক গোপনে হস্তকৃত সম্ভোগদোষে আসক্ত হইলে তাহারা প্রায়ই লোকসমাজে যাইতে অনিচ্ছুক হয়, তাহাদের শরীর কৃশ, মুখ মলিন ও চক্ষু বসিয়া যায় ও উহার চারিদিকে কালিমা পড়ে, হৃৎকম্প, নাড়ী ধীরগামী এবং শরীর হইতে একপ্রকার দুর্গন্ধযুক্ত ঘ্রাণ নির্গত হয়।...স্বামীর সঙ্গে অতিরিক্ত সম্ভোগে রমণীদের স্বাস্থ্যভঙ্গাদি ও স্বভাবের অতিশয় পরিবর্তন ঘটে।...ইহারা স্বামী হইতে দীর্ঘকাল পৃথক থাকিলে প্রায় সুস্থ থাকে এবং একত্রে বাস করিতে লাগিলে প্রবল রজসাধিক্য, রজঃকৃচ্ছ্র ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয়।[২৫]

স্কুল কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক এবং বিশেষত অভিভাবকদের হাতে হস্তমৈথুন নির্মূল করার পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব তুলে দেবার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির শরীর এবং যৌনতাকে এক কঠোর নজরদারির আওতায় নিয়ে আসার চেষ্টা যেমন চলেছে, তেমনই সমকালীন সমাজে এই বিষয়টিকে নিয়ে প্রকাশ্য আলোচনা করতে গিয়েও এক ধরনের দ্বন্দ্ব এবং টানাপোড়েনের শিকার হয়েছেন লেখকেরা। যদিও তাদের মধ্যে অনেকেই ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই সুখভোগ উদ্রেককারী শারীরিক অভ্যাসটির বিরোধিতা করার জন্য প্রকাশ্য আহ্বান জানিয়েছেন। 'চিকিৎসা সম্মিলনী' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি লেখায় বলা হয়েছে :

> 'দুঃখের বিষয় অধিকাংশ বালকদিগের পক্ষে হস্তমৈথুন ব্যাপার সর্বনাশজনক হইলেও বিষয়টার মধ্যে একটু অশ্লীলতার আভাস আছে বলিয়া দেশের বর্তমান সুশিক্ষিত মহাশয়রা এসকল কথার আন্দোলন আলোচনার আদৌ পক্ষপাতী নন।[২৬]

আবার 'অনুবীক্ষণ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি লেখায় বলা হয়েছে:

> 'পিতা মাতা শিক্ষক অভিভাবক এবং দেশহিতৈষী সহৃদয় ব্যক্তি সকলেই আলস্য ত্যাগ করিয়া মোহনিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করুন। আর সময় নাই, চীৎকার ধ্বনিতে মুক্ত কণ্ঠে অল্পবয়স্ক সন্তানদিগকে অনৈসর্গিক উপায়ে রেতঃপাতন হইতে সাবধান করুন। বৃথা লজ্জার পরবশ হইয়া পুণ্যভূমি ভারতকে আর অবনত করিবেন না। অশ্লীল কথা কী প্রকারে মুখে আনিয়া অশ্লীল ব্যবহার হইতে বালকদিগকে নিরস্ত হইতে উপদেশ করিব এই বৃথা লজ্জায় আমাদিগের সর্বনাশ হইতেছে।[২৭]

আরও একটা ব্যাপার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যৌনতার 'মেডিক্যালাইজেশন' প্রক্রিয়ার আলোচনায় লেখকেরা পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যার চেয়ে দেশীয় ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের উপর অনেক বেশি নির্ভর করতে চাইছেন। পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধেই লেখক বলেছেন :

> 'অস্মদেশীয় ধর্মশাস্ত্র, স্মৃতি ইত্যাদি যত উপযোগী, বোধহয় পৃথিবীস্থ আর কোনও দেশীয় শাস্ত্রই এত উপযোগী নহে...কিছুদিন পূর্বে অনেকের নিকটে শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থা সদভিপ্রায়হীন কুসংস্কার বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু এক্ষণে বয়োবৃদ্ধি ও চিন্তাশীলতার প্রসাদাৎ তাঁহারাই বলেন, ইউরোপীয় হাইজিন শাস্ত্র (চিকিৎসাশাস্ত্রান্তর্গত স্বাস্থ্য সংরক্ষক শাস্ত্র) অপেক্ষা অস্মদেশীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্মশাস্ত্র সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ ও হিতকারী...ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা এদেশীয় লোকের শারীরিক অবস্থা বিষয়ে এত অনভিজ্ঞ যে, তাঁহাদিগের ব্যবস্থা অনেক সময় আমাদের অহিতকর হইয়া উঠে...[২৮]

আলোচনা একটু বেশি উদ্ধৃতি-কণ্টকিত হয়ে গেল। কিন্তু এই লেখাগুলোর বিস্তৃত উল্লেখের মধ্য দিয়ে এটাই দেখতে চাইছি যে, জ্ঞান, যুক্তি, শিক্ষা, দর্শন, রাজনীতি, সংস্কৃতির মতোই চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগের বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা পাশ্চাত্যের জ্ঞানকাঠামোর ধারায় নিজেদের ধারণাকে প্রণালীবদ্ধ করতে চেয়েছেন, পাশাপাশি তাদের নিজেদের দেশীয় ঐতিহ্যের থেকে লব্ধ জ্ঞানও বারবার প্রাধান্যমূলক অবস্থানে চলে আসতে চেয়েছে। এই দ্বন্দ্ব-আপসের প্রক্রিয়ার মধ্যেই লুকিয়ে আছে আমাদের নিজস্ব 'আধুনিকতা'র পৃথক ইতিহাস, যা শরীর-যৌনতার উরোপীয় অবদমন প্রক্রিয়াকে আত্মস্থ করেছে নিজেদের অভিজ্ঞতালব্ধ সংস্কারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, হয়ে উঠেছে এক সম্পূর্ণ মিশ্র ধরনের জ্ঞানভাণ্ডারের জগৎ, যদিও এর ফলে কলোনির প্রজার ব্যক্তিগত জীবনে ক্ষমতার অবদমন প্রক্রিয়াটি হয়ে উঠেছে আরও হিংস্র, আরও জটিল। 'চিকিৎসাসম্মিলনী'র লেখক যখন বলেন : 'পশুরাও অযথা কামাচার করে না...আর মনুষ্য কি বুদ্ধিমান জীব হইয়া এমন গুরুতর বিষয়ে সম্যক অবহেলা করিয়া আপনার সভ্যতার পরিচয় দিবে?[২৯] তখন সতেরো শতকের ইউরোপে সন্ত ফ্রান্সিস-কথিত 'হাতি আদিকল্পে'র সঙ্গে এই কণ্ঠস্বরের আদৌ কোনও পার্থক্য থাকে কি?

আসলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পরিবার, পারিবারিক মূল্যবোধ, পারিবারিক অনুশাসনের আওতায় সন্তানের চরিত্র গঠন সংক্রান্ত নতুন কয়েকটি তথাকথিত 'যৌক্তিক' ধারণার জন্ম হয় বাংলার শিক্ষিত সমাজে। যেহেতু ঔপনিবেশিক শাসনের আওতায়, বাইরের জগতে, সাধারণ মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোকে'র পক্ষে কোনও ধরনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় খণ্ড, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩০৬।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং"

স্বাস্থ্য

মাসিক পত্র।

কুচবিহারের ভূতপূর্ব্ব-সিবিল সার্জ্জন

শ্রীদুর্গাদাস গুপ্ত, এম্-বি কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

সূচী।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ,—	
হাওয়া খাওয়া	১
গৃহ ও গৃহী	২
ছেলের খেলা	৩
কলিকাতায় জ্বরবৃদ্ধি	৪
ম্যালেরিয়ার প্রাধান্য	৫
কলিকাতার চৌরঙ্গি	৬
পুরস্কৃত উপদেশ বাক্য	৭
বর্ষসমালোচনা	৮
পল্লীগ্রামে জলকষ্ট	১৩
ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ডাক্তারের মত	১৫
প্লেগ ও সর্পবিষ চিকিৎসা ...	২০
প্লেগের পূর্ব্বে বোম্বাই ...	২২
স্বাস্থ্য-সংহিতা	২৫
ফোটক	২৭
বিবিধ	৩০
সংবাদ	৩১
মফঃস্বল	ঐ

কলিকাতা:

২৩, মদন মিত্রের লেন, স্বাস্থ্য-কার্য্যালয় হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৬০ নং বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট "বসু প্রেসে"

জি, সি, বসু এণ্ড কোংর দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৬ সাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষমতাকেন্দ্রকেই করায়ত্ত করা সম্ভব ছিল না, কোনো ধরনের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক এমনকি সামাজিক নিয়ন্ত্রণের শক্তিও তার ছিলনা, সেকারণেই বাইরের জগৎ থেকে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের দৃষ্টি সরে এসে পুরোপুরি কেন্দ্রীভূত হল পারিবারিক অন্তঃপুরে। পরিবার, পিতা-মাতা, শিশুর শৈশব ও তার চরিত্রগঠন পদ্ধতি—ইত্যাদি হয়ে উঠল 'বৈজ্ঞানিক' আলোচনার বিষয়বস্তু। যেহেতু বাইরের জগতে 'নেশন' সংক্রান্ত ধারণার বাস্তবায়ন ঘটানোর কোনও উপায়ই ছিল না, তই পরিবার হয়ে উঠল বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন এক সার্বভৌম ক্ষেত্র, যেখানে বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত তার মনের মতো পরিসর খুঁজে পেতে পারে ক্ষমতা প্রয়োগের। 'অন্তঃপুর' হয়ে উঠল বাইরের জগতে অসম্ভব এক 'নেশন'-এর বাস্তব রূপায়ণ। তনিকা সরকারের মতে :

> 'The management of household relations becomes a political and administrative capability, providing training in governance that one no longer attains in the political sphere. The intention is to establish a claim to share of power in the world, a political role that the Hindu is entitled to, via successful governance of the household.'[৩০]

এই সার্বভৌম ঘরোয়া, পারিবারিক 'নেশন'-এর একচ্ছত্র অধিপতি হলেন পিতা—যিনি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের প্রতিভূ। মা-এর কাজ পিতার আধিপত্যে মদত ও সহায়তার যোগান দেওয়া। বাইরের পৃথিবীতে বৃটিশ কলোনির প্রজা হলেও, ঘরের ভিতর পিতাই শাসক, তাঁর যৌক্তিক স্বেচ্ছাচার চালানোর উপযুক্ত ক্ষেত্র হল—সন্তান। এখানে শিশুসন্তান প্রজা বা subject-এর ভূমিকা নিচ্ছে। ঔপনিবেশিক প্রভাবে adulthood এবং childhood এর ধারণাও নতুন করে পুনর্নির্মিত হয়েছিল শিক্ষিত বাঙালির মননে। 'শৈশব'-কে 'প্রাপ্তবয়স'-এর অসম্পূর্ণ ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসেবে ধরে নিয়ে নিরন্তর শিক্ষা, নিয়মানুবর্তিতা, শাসন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাস্তি, জ্ঞানানুশীলনের মধ্য দিয়ে তাকে যুক্তিবাদী, পূর্ণাঙ্গ, প্রাজ্ঞ-প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে গড়ে তোলার ধারণা প্রাধান্য পেতে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ-নজরদারি-শাসনের প্রক্রিয়াটির মসৃণ 'স্বাভাবিকীকরণ' এমভাবে ঘটানো হয়, যাতে, শিশু কখনোই বুঝতে না পারে যে, সে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, বরং সে 'self discipline' এবং 'self organisation' এর প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। আর এই প্রক্রিয়ায় শিশুর 'শরীর' এক সুশৃঙ্খল ক্ষমতাকাঠামোর দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে যায়। একজন সাম্প্রতিক গবেষক দেখিয়েছেন :

> 'The family is here viwed as a ministate in operation. Within the confines of the family, children are segregated in a professionally supervisd environment, as in the prison or the asylum, and the child's character is molded by means of dominance and punishment. The method assums effective control over the child's body; indeed, the body becomes the site of the disciplinary exercise.'[৩১]

এভাবেই প্রতিটি শিশু পারিবারিক ক্ষমতা-কাঠামোর ঘেরাটোপে বাবা মা-র চব্বিশ ঘণ্টাব্যাপী স্ক্রুটিনির আওতায় চলে আসে। শিশুর শরীরের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর যৌনতাও এই তত্ত্বাবধানের পরিসরে ঢুকে পড়ে। যৌনতা, যৌন-আচরণের ভালো-খারাপ দিক, যৌনাঙ্গের অপ্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যহীন ব্যবহার, বীর্যসংরক্ষণের গুরুত্ব—সবকিছুই এই তত্ত্বাবধানের এলাকায় অজস্র শাসনের code গড়ে তোলে, যে code-গুলো আমরা আজকের সমাজেও প্রায় একইভাবে, সামান্য অদলবদল ঘটিয়ে মেনে চলেছি প্রতিদিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫

কেশবচন্দ্র সেন, কালীচরণ ব্যানার্জি, শোভাবাজারের রাজা কালীকৃষ্ণ দেব প্রমুখের উদ্যোগে Society for the Suppression of Public Obscenity প্রতিষ্ঠিত হলে (২০ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩) সমকালীন সংবাদপত্রে এর পক্ষে-বিপক্ষে বিতর্ক শুরু হয়। ঐ বছরই 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'অশ্লীলতা' প্রবন্ধটি। উনিশ শতকের কলকাতায় লোকায়ত সংস্কৃতির নিজস্বতা, নাগরিক নিম্নবর্গের স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর ও তার বহিঃপ্রকাশের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষা-অভিমানী এলিটের আধিপত্য চাপিয়ে দেবার দুর্মর বাসনা হিসেবে প্রবন্ধটিকে পড়া যেতে পারে। আমরা জানি, উনিশ শতকের গোড়া থেকেই কলকাতার লোকসংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল যে কবিগান, আখড়াই-হাফআখড়াই, তরজা, খেউড়, খেমটা, ঢপ কীর্তন, চড়ক-সঙের মিছিল সহকারে, তার প্রধান সমঝদার এবং প্রশ্রয়দাতারা ছিলেন শহরের অগণিত সাবঅল্টার্ন মানুষজন। যদিও বিভিন্ন পর্যায়ে শহরের উচ্চবর্ণ অভিজাতরাও এর পৃষ্ঠপোষক হিসেবে উপস্থিত থেকেছেন। কলকাতার পার্শ্ববর্তী গ্রামীণ সংস্কৃতির ধারক-বাহক নিম্নবর্গের মানুষজন গড়ে তুলেছে কবিগানের সংস্কৃতি, পরে উচ্চবর্ণের মানুষজনের প্রত্যক্ষ প্রশ্রয়ে গড়ে উঠেছে 'হাফ-আখড়াই'-এর দল। অর্থাৎ এইসকল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শ্রেণিনির্বিশেষে জনগণের অংশগ্রহণ ঘটত। এই যৌথ অংশীদারির প্রক্রিয়াটি যেমন আকর্ষণীয় তেমনই জটিল। ঐ সাংস্কৃতিক প্রকরণগুলোর মধ্য দিয়েই কবিয়ালরা কলকাতার নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, নৈরাশ্য, আমোদ-প্রমোদ, নালিশ প্রতিবাদকে ফুটিয়ে তুলতেন। তঁদের গানে অভিজাত প্রভাবশালী সম্প্রদায়ের কাজ-কারবার নিয়ে প্রকাশ্য বিদ্রূপ, তীক্ষ্ণ মন্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানবিরোধী সাবঅল্টার্ন চৈতন্য ফুটে উঠত। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই একে 'বিকৃত রুচি'র সংস্কৃতি হিসেবে চিহ্নিত করেন। আসলে কবিগানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষয়বস্তু, ভাষা, বাচনভঙ্গি, গায়নপদ্ধতি, উপলক্ষ, শ্রোতাদের সামাজিক অবস্থান—সবকিছুই শিক্ষিত এলিটের পক্ষে মহা অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এইসব গানে যৌনাত্মক ও শরীরকেন্দ্রিক শব্দ ব্যবহার, ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনা, আদিরসাত্মক নাচগান, ঠাট্টা-রসিকতা, আমোদ-আহ্লাদ—কোনওকিছুই রুচিবাগীশ শিক্ষিত উচ্চবর্গের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। তাই ইংরেজ প্রশাসনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এইসব 'অনালোকিত' সামাজিক আবর্জনা ঝেঁটিয়ে বিদায় করাই কাম্য বলে মনে করেছেন এলিট 'ভদ্রলোকে'রা।

'বঙ্গদর্শন'-এর প্রবন্ধটি সমকালীন গণসংস্কৃতির প্রতি উচ্চবর্গীয় উন্নাসিকতার একটি ধ্রুপদী নিদর্শন। এই প্রবন্ধের গোড়াতেই 'অশ্লীলতা নিবারণী সভা'র কার্যক্রমকে দুহাত তুলে সমর্থন জানানোর সঙ্গে সঙ্গে এই সভার বিরোধী সংবাদপত্রগুলোকে 'অশ্লীলতাপ্রিয়, অশ্লীলতা ও অসভ্যতা তাহাদিগের ব্যবসায়'—বলে আক্রমণ করা হয়েছে। এরপর বাঙালির নিম্নবর্গীয় সংস্কৃতিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে লেখকের মন্তব্য:

> 'অশ্লীলতা, বঙ্গদেশীয়দিগের জাতীয় দোষ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাঁহারা ইহা অত্যুক্তি বিবেচনা করিবেন তাঁহারা বাঙ্গালীর রহস্য, বাঙ্গালীর গালি, নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের কোন্দল এবং বাঙ্গালীর যাত্রা, কবি পাঁচালী মনে ভাবিয়া দেখুন।[৩২]

অথচ, কী আশ্চর্য, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটার সঙ্গে সঙ্গেও এই 'জাতীয় দোষ' অস্তমিত হচ্ছে না। লেখক বলেছেন:

> জ্ঞানালোক সহকারে অশ্লীলতার দিন দিন হ্রাস দূরে থাকুক, বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এখন, এমন অনেক সম্বাদপত্র ও পুস্তক দেখিতে পাই, যে তাদৃশ অশ্লীল পত্র বা পুস্তক পাঁচ সাত বৎসর পূর্বেও দেখা যাইত না। এ সকল পত্র বা পুস্তক অবশ্য অনেকের দ্বারা পঠিত হয়, নচেৎ লুপ্ত হইত।[৩৩]

লেখক মনে করেছেন বর্তমানে আগের চেয়ে শিক্ষার হার সামান্য বৃদ্ধি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাওয়াই এর প্রধান কারণ। যেহেতু :

> সামান্য শিক্ষার বৃদ্ধি হওয়ায়, অল্প শিক্ষিত পাঠকের শ্রেণী বাড়িয়াছে।...তাহাদের মনোরঞ্জনার্থ এক শ্রেণীর লেখক উৎপন্ন হইয়াছে। তাহারাও সেই অল্প শিক্ষিত শ্রেণীর লোক—তাহাদের রুচি মার্জিত এবং পরিশুদ্ধ হয় নাই—সুতরাং অশ্লীলতা এবং কদর্য্যতাপ্রিয়।[৩৪]

বোঝাই যাচ্ছে, ১৯ শতকের গোড়া থেকেই চিৎপুর রোড সংলগ্ন বটতলা থেকে যে অজস্র সস্তা বইপত্র ছাপানো হত এবং এক সুদীর্ঘ কালপর্বব্যাপী যে 'বটতলার বই' কলকাতা তথা বাংলার নীচু তলার মানুষের শিক্ষা, নীতিবোধ, বিনোদন ও সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেই সস্তা বিদ্যাসুন্দর-কৃত্তিবাস-কাশীরাম-মুকুন্দরাম, সমসাময়িক সামাজিক কেচ্ছাকাহিনি, কামসাহিত্য, রোমাঞ্চকর ঘটনাবলি অবলম্বনে বইপত্র, প্রহসন-নকশা (যেমন—'হরিদাসের গুপ্তকথা', 'কলির বউ হাড়জ্বালানী', 'পাশ করা মাগ', মোহন্ত এলোকেশীর কাহিনি, বেশ্যাসংগীত, ইসলামী নীতিশাস্ত্র, বিচিত্র ধরনের কামসাহিত্য জাতীয় বই), যা আধুনিক গবেষকদের মতে উনিশ শতকের নাগরিক লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের 'সোনার খনি', তাকে 'বঙ্গদর্শন'-এর লেখক এককথায় খারিজ করে দিচ্ছেন। লেখক যাদের অল্পশিক্ষিত রচয়িতা পাঠক বলে চিহ্নিত করেছেন, সেই সামান্য শিক্ষিত লেখকরাই মৌখিক উচ্চারণ অনুযায়ী, অশুদ্ধ বানানবিধি বজায় রেখে লিখতেন এইসব বই, 'খুঁট আখুরে' পাঠকদের জন্য। এখানেই থেমে না থেকে 'বঙ্গদর্শন'-এর লেখক লোকসমাজের অশিক্ষা দূর করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে বলেছেন :

> যাঁহারা সুশিক্ষিত, বিশুদ্ধ রুচি তাঁহারাই অগ্রসর হইয়া অশিক্ষিত পাঠকের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। সুশিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁদের পৃষ্ঠপোষক হয়েন, তাঁহারাই সেই বলে অশিক্ষিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্প্রদায়কে শাসিত করিয়া তোলেন।[৩৫]

'শাসিত' শব্দটা লক্ষ করুন। পাশ্চাত্য 'আলোকায়ন' উদ্ভূত জ্ঞান যে 'ক্ষমতা'র আধার, তা এই শব্দ ব্যবহার থেকেই মালুম হচ্ছে। অর্থাৎ শুধুমাত্র ইংরেজি শিক্ষার জোরেই এগিয়ে থাকা নেটিভ বুদ্ধিজীবী তার নিজের দেশের এইসব তথাকথিত 'অশিক্ষিত' নেটিভদের 'অপর' ভাবছে এবং তাদের উপর সাংস্কৃতিক আধিপত্য চালাবার বৈধতা অর্জন করার দাবি জানাচ্ছে। যদিও এই প্রবন্ধের শেষাংশে পৌঁছে লেখক বলছেন—'এমন অনেক কাব্য আছে যে তাহা অশ্লীলতা দোষযুক্ত হইলেও মনুষ্যবুদ্ধিসৃষ্ট রত্নের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া চিরকাল আদরে রক্ষণীয়।' এখানে 'অশ্লীলতা দোষ' কথাটা ব্যবহারের মধ্য দিয়েই বোঝা যাচ্ছে দ্বিধাবোধ সম্পূর্ণ কাটেনি, তবে 'চিরন্তন সাহিত্যকর্ম' বলেই সেগুলি বঙ্গদর্শনের সার্টিফিকেট পাবার অধিকারী।

এই প্রবন্ধ ছাপা হবার দুদশক পরে 'সাধনা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখছেন 'কবিসংগীত' প্রবন্ধটি। সেখানে তিনি স্পষ্টই বলছেন—'ইংরাজের নূতন সৃষ্ট রাজধানীতে...কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি এবং সেই হঠাৎ রাজার সভার উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান।' প্রবন্ধের শেষে একই 'এলিট' মানসিকতার প্রতিফলন দেখতে পাই, যখন রবীন্দ্রনাথ বলেন:

> এই সকল ক্ষণকালজাত ক্ষণস্থায়ী সাহিত্যে ভাষা ও ভাবের ইতরতা, সত্য ও সাহিত্যনীতির ব্যাভিচার এবং সর্ববিষয়েই রূঢ়তা ও অসংযম দেখিতে পাওয়া যায়। অচিরকালেই সাধারণের এমন উন্নতি হইবে যে, তাহার অবসর বিনোদনের মধ্যেও ভদ্রোচিত সংযম, গভীরতর সত্য এবং দুরূহতর আদর্শের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাইব। তাহাতে কোনও সন্দেহ নেই।[৩৬]

এও কি ওই 'এনলাইটেনমেন্ট' উদ্ভূত সামাজিক প্রগতির সরল একরৈখিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঠামোয় অলীক বিশ্বাস নয়? যেন সত্যিই ইতিহাস ওরকম কোনও 'স্ট্রেটকাট' হাইওয়ে ধরে এগোয়, যার ফলে নিম্নবর্গের চৈতন্যকেও অচিরেই ঢেলে সাজিয়ে নেওয়া যাবে উচ্চবর্ণের জ্ঞান-যুক্তির আলোয়, যে আলো তৈরি করেছে ওই 'গভীরতর সত্য' ও 'দুরূহতর আদর্শ'-এর বানিয়ে তোলা ধারণাসমূহ। কিন্তু সত্যিই কি ইতিহাস ওরকম কোনও সোজা সরল পথে এগোয়? আজ 'নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক'দের মূল্যবান গবেষণাগুলি থেকে আমরা জানতে পারি ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়েই নিম্নবর্গ তার স্বতন্ত্র চৈতন্যকে বাঁচিয়ে রাখে। উচ্চবর্গের সঙ্গে তার সম্পর্ক মূলত সমঝোতার, কিন্তু কোনো কেনো বিশেষ মুহূর্তে প্রকাশিত হয়ে পড়ে তার চেতনার স্বাতন্ত্র্য। তুচ্ছ খড়কুটো অবলম্বন করেই সে উচ্চবর্গের সাংস্কৃতিক আধিপত্যের মুখোমুখি দাঁড় করায় নিজেকে। উচ্চবর্গ তার যেসব সাংস্কৃতিক toolsকে ব্রাত্য করে দেয়, সেগুলো আঁকড়ে ধরেই সে আত্মরক্ষা করে, শ্বাস নেয়, বাঁচিয়ে রাখে নিজেকে।

যেমন ধরুন, গোপাল ভাঁড়। নবদ্বীপের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার প্রখ্যাত বিদূষক গোপাল পরামাণিকের পেশা ছিল ভাঁড়ামি। তার বহুল জনপ্রিয় রঙ্গরসিকতার হাজারো ভারসন গোটা উনিশ শতকের মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন বটতলার প্রকাশকেরা। জনসাধারণের খুব কাছের লোক হয়ে উঠেছিল গোপাল। অথচ ঔপনিবেশিক শিক্ষায় অভ্যস্ত উনিশ শতকের 'ভদ্রলোক' গোপাল ভাঁড়ের হাস্যরসাত্মক কাহিনির মধ্যে অচিরেই খুঁজে পেলেন অশ্লীলতা। গোপাল ভাঁড়ের গল্পের তীক্ষ্ণ আয়রনি ও উইট, যৌন কাতুকুতু, উদ্ভটত্ব, সাবভার্সন, শরীরী ইঙ্গিত—সবই শিক্ষিত মানুষের কাছে বর্জনীয় বলে বিবেচিত হল। আমজনতার কাছে যা রসের খনি, শহুরে শিক্ষিত বাবুদের কাছে তা 'অশালীন'। সর্বজনীন শিক্ষার প্রসার, শালীনতা-অশালীনতার এলিট মাপকাঠি নির্ধারণের ধারাবাহিকতায় আজ গোপাল ভাঁড় আপাতভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিস্মৃত। শিক্ষিত মানুষ আজ আর গোপাল ভাঁড়ের গল্পে বিনোদন খোঁজে না। কিন্তু তাই বলে কি গোপাল ভাঁড় আজ সত্যিই বিস্মৃত এবং অবলুপ্ত? মোটেই নয়। আজও গোপাল ভাঁড়ের গল্প নিয়ে নিত্যনতুন বই বেরোচ্ছে। সস্তা কাগজে ছাপা রঙচঙে মলাটের বই সেসব। গৌতম ভদ্র একটি সাম্প্রতিক লেখায় বলেছেন : 'গোপাল হার মানার পাত্র নয়। বাবুদের খোশগল্পের আসরে তার আর জায়গা নেই, তাতে তার থোড়াই। 'মুকুল', 'মৌচাক' ও 'শিশুসাথী'র দৌলতে বিশ শতকের গোড়া থেকেই ছোটোদের হয়ে যেতে থাকল সে। দুয়েকটা শব্দ ও ইঙ্গিত বাদ দিয়ে গোপালের বই প্রাইজও দেওয়া হত।...(তারপর থেকে) গোপাল হাজাররকম মার্জিনে ঘুরে বেড়ায়—সেনোলে রেকর্ডে, সিনেমার স্লাইডে, ডালডার বিজ্ঞাপনে, টি.ভি. সিরিয়ালে ও ডেলি প্যাসেঞ্জারে ভর্তি রেলের হকারের চিৎকারে। এই তো সেদিন, কলেজ স্ট্রিটে 'মেট্রো রেলে গোপাল'-ও উঁকিঝুঁকি মারছে দেখলাম।'[৩৭]

তবে উনিশ শতকের শিক্ষিত সমাজের সকলেই লোকসমাজে প্রচলিত এই ধরনের 'সাবকালচার' এবং 'সাবটেক্সট'গুলোর উপর খড়্গহস্ত হয়েছিলেন এমনটা নয়। বরং শিক্ষিত বাঙালি পাশ্চাত্য রুচির দোহাই দিয়ে দেশীয় সমাজের নিজস্ব ভালোলাগার বিষয়গুলোকে বর্জন করছে—ব্যাপারটা ভালোভাবে নেন নি অনেকেই। বিপিনবিহারী গুপ্তকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সে যুগের বিখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব রাধামাধব কর বলছেন ১২৭১ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে বেলা দশটা থেকে বিকেল তিনটে পর্যন্ত প্রচণ্ড ঝড়ে নগরবাসীর নাকাল হওয়া নিয়ে সেসময় অসংখ্য ছোটো-বড়ো কবিতা লেখা হয়েছিল। কবি ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন :

কি ঝাড়ন ঝেড়েছ বাবা একাত্তরের ঝড়ে
চাল চুলো সব গেল উড়ে
বাবা, ঝড়ের কি গুঁতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উড়ে গেল মুতো
গরুগুলো হয়ে গেল বেঁড়ে।।

এরপরই রাধামাধবের টিপ্পনী—'ঝড়ের চোটে মুথা ঘাস, গরুর ল্যাজ খসিয়া যাওয়ার উল্লেখের পর আর কোনও কবি বাড়াবাড়ি করিয়া একাত্তরের ঝড় লইয়া উচ্ছ্বাসময়ী কবিতা রচনা করিতে সাহস করেন নাই।'[৩৮] লক্ষণীয় এই চটুল কবিতার রসগ্রহণ করতে গিয়েও রাধামাধব কোথাও অস্বস্তিবোধ করছেন না। এমনকি পুরোনো কবিগান, যাত্রার আসর সম্বন্ধে নব্যশিক্ষিতদের রুচিবাগীশ মানসিকতাকে একহাত নিয়ে রাধামাধবের মন্তব্য :

> এখন এমনটি দাঁড়াইয়াছে যে, অসঙ্কোচে কবির লড়াই লইয়া আলোচনা করা শক্ত। কিন্তু তখন ভদ্রসমাজে কাহারও মনে কোনও খটকা লাগিত না। সত্যবতী অম্বালিকাকে যখন বংশরক্ষার জন্য ব্যাসদেবের নিকট যাইতে পীড়াপীড়ি করিতেন, তখন কোনও ভদ্রসন্তানই সভা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন না; বরং সকলেই অম্বালিকার উত্তর শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিতেন।[৩৯]

৬

'বঙ্গদর্শন'এর প্রবন্ধে যদি খুঁজে পাই লোকসমাজের নিজস্ব অভিব্যক্তিগুলির প্রতি এলিটের উন্নাসিকতা, তবে নাগরিক নিম্নবর্গও চুপ করে বসে থাকেনি। ১৮৭৪ সালে কাঁসারীপাড়ার সঙেরা একটি গান প্রচার করে, যাতে শিক্ষিত মানুষের এইসব নাক-উঁচু ব্যাপার-স্যাপারকে রীতিমত চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করা হয়। গানটি এরকম :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজব শহর কলকেতা।
হেতা ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে
বলিহারি সভ্যতা।।
শহরে এক নূতন হুজুগ উঠেছে রে ভাই
অশ্লীলতা শব্দ মোরা আগে শুনি নাই
এর বিদ্যাসাগর জন্মদাতা
বঙ্গদর্শন এর নেতা।
এদের কথার মাত্রা অশ্লীলতা
সদা দেখতে পাই।
কারে বলে অশ্লীলতা লেজ তুলে দেখা নাই।[৪০]

সরাসরি বিদ্যাসাগর-বঙ্গদর্শনের উল্লেখ থেকেই বোঝা যাচ্ছে এই অশ্লীলতা উচ্চবর্গের একটি সাম্প্রতিকতম 'আবিষ্কার' মাত্র। এবং এই নব্য রুচিশীলতার চশমা লাগিয়েই তাঁরা সস্তায় হইচই জুড়ে দিয়েছেন—'সস্তা দরে মস্ত নাম কিনতে যত লোক/এই সুযোগে তাদের সবার ফুটে গেল চোখ।' এমনকি এই নয়া-পিউরিটানদের হাত থেকে বাঙালির চিরকালীন কাব্যগুলোও রেহাই পাচ্ছে না।

সেদিন বাঙ্গালা ভাষার প্রধান প্রধান
কাব্য সকল লয়ে
অশ্লীল বলে সেসব দিলে পাঠিয়ে যমালয়ে
দেখ ভারতচন্দ্র পার পেল না
অন্য কবির কি কথা
কবিত্বের গন্ধ আর মায়া যদি থাকত দেশের প্রতি
তবে দেশের গৌরব ভারতচন্দ্রের কর্ত্তেন না এ গতি
এরা ইংরেজিতে পণ্ডিত ভারী, কাব্যদেবীর হন সতা।।[৪১]

এরা 'বিজাতীয়' শিক্ষার গৌরবে নিজের দেশের প্রতি মায়া-মমতাটুকুও হারিয়েছেন—এমনটাই বিশ্বাস লোককবির। এখানে আপামর জনসাধারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং শিক্ষিত সম্প্রদায় যেন দুই পৃথক বর্গে বিভক্ত। যেন তাদের একে অপরের মধ্যে জল-অচল ব্যবধান। এই অসেতুবন্ধন দূরত্বের কথাই বলা হচ্ছে গানের পরবর্তী অংশে :

বৎসরান্তে একটি দিন কাঁসারীরা যত
নেচে কুঁদে বেড়ায় সুখে, দেখে লোক কত
এতে গরীব লোকের আমোদ বড়, সভ্যতার মাথাব্যথা...
সামান্য লোক নাচলে কুঁদলে আমোদ বড় তায়
ছেলেপিলের সং দেখিতে আমোদ বড়
বুড়োর কেবল ফাঁস কথা...[৪২]

এখানে 'সভ্যতা' এবং 'গরীব লোক' পরস্পরবিরোধী দুই শিবিরে অবস্থান করছে। 'ছেলেপিলে' আর 'সামান্য লোকে'র আমোদে শিক্ষাভিমানী 'বুড়ো' অর্থাৎ 'ভদ্রলোক'দের মাথাব্যথা—যা এদের চোখে বিস্ময়ের। বস্তুত সঙের মিছিল বন্ধ করার জন্য বাবু কেশবচন্দ্র সেন এবং সম্প্রদায় প্রশাসনিক স্তরে নিয়মিত আবেদন নিবেদন শুরু করেন। উনিশ শতকের গোড়া থেকে গাজন চড়ক সঙের মিছিল উপলক্ষে হাজার হাজার শ্রমজীবী জনতার সমাবেশ ব্রিটিশ সরকারের চোখে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এবার সমাজের অভিজাত শিক্ষিত ব্যক্তিরাও হাত মেলালেন প্রশাসনের সঙ্গে। ১৮৭৪ সালেই তৎকালীন পুলিস কমিশনার স্টুয়ার্ট হগ সঙের মিছিল বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল এবং তারকনাথ প্রামাণিকের হস্তক্ষেপে শেষ অব্দি পুলিস আর বেশি দূর এগোতে পারেনি। এর ফলে জনতার স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাস প্রকাশ পেয়েছে এই পঙ্‌ক্তিগুলোয়— 'তাড়াতাড়ি কাগজে লিখে, বরার লেজ ধোরে/ বড় ইচ্ছা ছিল দেবেন পাস বন্ধ কোরে/এখন দিগ্‌গজেরা রৈলেন কোথা/ রৈল কোথা ক্ষমতা'। যাই হোক, এরপর সংগীতকার ওইসব তথাকথিত ভদ্রলোকের উদ্দেশে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেছেন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গরীবের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে এরা ভাই
ইংরেজদের কাছে কেমন দেখাচ্ছে বড়াই...
এত ভদ্রলোকের বাটীর সমুখে
দ্বার দে মোরা যাই
এতে খুশী বৈ তো বেজার মুখ
কারো দেখি নাই।...
যদি ইহা এত মন্দ
মনে ভেবে থাকো
নিজের মাগকে চাবি দিয়ে
বন্ধ করে রাখো
জানি, সভ্যদের হয়ে স্বাধীন মেয়ে
ë ÆÆÆû þì ö Ëö ü ö Æö ½[৪৩]

প্রতিটি লাইনে উচ্চবর্গ এবং তাদের আমদানি করা 'সভ্যতা'র ধারণার বিরুদ্ধে রচয়িতার অন্তর্জ্বালা এক সমষ্টিগত বিদ্রূপের আকারে ফেটে পড়তে চাইছে। যাকে আমরা সাবঅল্টার্নের নিজস্ব চৈতন্য হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। সমকালীন দুয়েকটি পত্রিকাও এদের সমর্থনে এগিয়ে আসে। যেমন 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর একটি সংখ্যায় সঙের মিছিল সম্পর্কে অশ্লীলতার অভিযোগ নস্যাৎ করে দিয়ে বলা হয়েছিল :

> It would not be at all strange if some obscene words and gestures should find expression...There was considerable homour, very broad humour too, but nothing obscene.[৪৪]

আর পূর্বোল্লিখত সঙের গানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে 'বসন্তক' পত্রিকা মন্তব্য করেছিল:

'এক্ষণে সামান্য লোকের আমোদ-আহ্লাদ ও উৎসব তো সকলই একে একে শেষ হইতেছে। এক্ষণে যাত্রা নাই, পাঁচালী নাই, কবির তো কথাই নাই। সামান্য লোকেরা কি লইয়া থাকিবেন? কেবল ধন্যেশ্বরী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর ছোবড়া টেনে কি দিনপাত হয়?...সামান্য লোকের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে এ সভ্যতা দেখান কেন?'[৪৫] বোঝাই যাচ্ছে অশালীনতা সম্পর্কে সেকালের শিক্ষিত সমাজও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

৭

যৌনতার প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করেছিলাম। আর উনিশ শতকের প্রেক্ষিতে বাঙালির যৌনতা, যৌন ভাবনা, যৌন আচরণ নিয়ে কথা বলতে গেলেই অনিবার্যভাবে চলে আসে নগর কলকাতা এবং প্রায় গোটা বাংলাদেশ জুড়ে সুসংগঠিতভাবে গড়ে ওঠা বেশ্যাপল্লি, বেশ্যাসংসর্গ এবং বেশ্যা-ভদ্রলোক সম্পর্কের কথা। বস্তুত ঔপনিবেশিক পর্যায়ে এই প্রাচীনতম পেশাটি সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতিতে, নিত্যনতুন উপাদান সহযোগে পুনর্গঠিত হয়ে ওঠে। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসন শুরু হবার আগে অব্দি এই পেশাটি পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের পক্ষে একটি নিতান্ত প্রয়োজনীয়, অপেক্ষাকৃত কম দোষার্হ পাপাচার বলে গণ্য হত। কিন্তু এদেশের কোম্পানির শাসন প্রবর্তিত হবার পর থেকে ঔপনিবেশিক আইন কাঠামোর সাপেক্ষে বেশ্যাবৃত্তি একটি বিপজ্জনক অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত হতে শুরু করে।

পাশ্চাত্য সমাজে দুতিনশ বছর ব্যাপী Power, Control, Repression-এর দ্বারা আধুনিক সমাজ কীভবে যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে — ফুকো তা দেখিয়েছেন। একথা সত্যি উনিশ শতকের বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসনের আওতায় ফুকো-কথিত 'ক্ষমতা' অতটা পরিব্যাপ্ত ও সর্বশক্তিমান হয়ে উঠতে পারেনি, তথাপি উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক প্রশাসনের 'ক্ষমতা' ক্রমশই এদেশের বেশ্যাসমাজ ও বেশ্যাসংসর্গে আসা এদেশীয় মানুষের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ জারি করতে চেয়েছে। এদেশের ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর মধ্যে ক্রমবর্ধমান বেশ্যাগমনের প্রবণতা এবং তজ্জনিত যৌনরোগবৃদ্ধিতে শঙ্কিত ব্রিটিশ সরকার বেশ্যাবৃত্তিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ন্ত্রিত উপায়ে পরিচালনা করার জন্য ১৮৬৪ সালে 'ক্যান্টনমেন্ট অ্যাক্ট' জারি করে। এই আইনের সাহায্যে সেনাছাউনিগুলোয় ইংরেজ এবং ভারতীয় সেনাদের জন্য পৃথকভাবে বেশ্যালয় নির্মাণ করে, তাদের রেজিস্ট্রিভুক্ত করা হয় (যেমন—গোরা সৈন্যদের জন্য 'লালকুলি চাকলা', দেশীয় সৈন্যদের জন্য 'কালা চাকলা')। অর্থাৎ উপনিবেশের ক্ষমতা বজায় রাখতে যারা সবচেয়ে বড়ো রাজনৈতিক স্তম্ভ, সেই সামরিক বাহিনীর স্বাস্থ্যক্ষয় রোধ করতেই দেশীয় যৌনব্যবসার উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রাথমিক সূচনা। কয়েক বছরের মধ্যেই এই নিয়ন্ত্রণ আরও কঠোর হয়। দেশীয় যৌনব্যবসার অন্তর্গত সমস্ত বারবণিতা ও তাদের খদ্দেরদের যৌনাচরণের উপর সরাসরি সার্বিক নিয়ন্ত্রণ জারি করতে ১৮৬৮ সালে CDA বা Contagious Diseases Act (Act XIV) যা থেকে এর নাম হয় 'চোদ্দ আইন') বিধিবদ্ধ করা হয়। যৌনব্যাধির সংক্রমণ বন্ধ করার জন্য বেশ্যাদের নাম নথিভুক্তিকরণ, নির্দিষ্ট দিনে সরকারি চিকিৎসকের দ্বারা বেশ্যাদের শরীরের মেডিক্যাল পরীক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়। ফলে কলকাতার বেশ্যাপল্লীগুলোয় পুলিশের দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়। একদিকে ডাক্তারি পরীক্ষার নামে বেশ্যাদের শরীরের উপর উৎপীড়ন অন্যদিকে পুলিশের হয়রানি থেকে বাঁচার জন্য ঘুষ দেবার বাধ্যবাধকতা—সব মিলিয়ে বেশ্যাদের ব্যবসা লাটে ওঠার যোগাড় হয়েছিল। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক বাংলায় স্বাধীন যৌনব্যবসার উপর কলোনিয়াল প্রভুর অবদমনমূলক চেহারাটা পরিস্ফুট হয়। মনে রাখতে হবে 'চোদ্দ আইন' জারি করা হয়েছিল, ঠিক সেইসময়ে খোদ ইংল্যাণ্ডে জারি হওয়া একটি অনুরূপ বেশ্যাবিরোধী আইনের অনুকরণে। যাই হোক, 'চোদ্দ আইন' প্রসূত নানারকম ঘটনাকে কেন্দ্র করে বটতলা থেকে অসংখ্য পুস্তিকা প্রকাশিত হতে শুরু করে। পুলিশের অত্যাচারে বেশ্যাদের নাজেহাল অবস্থা, তাদের শহর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া, বেশ্যাগমনকারী ভদ্রলোকদের উপর এর প্রভাব—এইসব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রহসন, গদ্য, কাব্যের বিষয়বস্তু। এইসব বইগুলোয় মোটের উপর 'চোদ্দ আইন'কে অভিবাদন জানানো হয়েছিল। যদিও বেশ্যাদের দুর্গতির বিস্তারিত ব্যাখ্যাও দিয়েছিলেন লেখকেরা। বইগুলো থেকে তৎকালীন শিক্ষিত ভদ্রলোক সমাজের বেশ্যা এবং বেশ্যাসংস্কৃতির প্রতি মনোভাব পরিস্ফুট হয়।

উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই পুরুষের পক্ষে পরিবারের বাইরে বেশ্যাপল্লীতে গিয়ে যৌনতার উপভোগে বিশেষ বাধা ছিল না। সমাজের উঁচু-নিচু শ্রেণি নির্বিশেষে এটা একধরনের প্রচলিত প্রথায় পরিণত হয়েছিল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু হয় বাঙালি ভদ্রলোকসমাজের লাগাতার বেশ্যাবিরোধী প্রচার অভিযান— যা ছিল ভিক্টোরীয় শিক্ষাপ্রসূত 'ক্ষমতা'র অভিব্যক্তি। ফলে, প্রকাশ্য সামাজিক যৌনতা নিয়ন্ত্রণে ঔপনিবেশিক 'ক্ষমতা'র কূৎকৌশল এবং শিক্ষিত ভদ্রলোকের তথাকথিত 'সমাজসংস্কার' প্রয়াস—একটাই বিন্দুতে এসে মিলে যায়। আসলে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতার বেশ্যাসমাজের একটা বিরাট অংশই ছিলেন উচ্চবর্ণীয় হিন্দু কুলীন পরিবার থেকে আগত গৃহকন্যা ও বিধবা। বেশিরভাগ সময়েই পুরুষের দ্বারা প্রতারিত হয়ে, কখনও বা পারিবারিক নিপীড়ন থেকে মুক্তি পাবার অছিলায় তাঁরা এসেছিলেন এই পেশায় (সমকালীন সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী এদের ভিতর প্রায় ৮০ শতাংশ মহিলাই উচ্চবর্ণের পরিবার থেকে আগত)। ভদ্রলোকদের বেশ্যাসম্পর্কিত আতঙ্কের একটা বড়ো কারণ ছিল— তাঁদের গৃহবন্দী 'ঘরের মেয়েরা' আশেপাশের পতিতাপল্লির মেয়েদের স্বাধীন জীবনাচরণ দেখে ওই পেশায় স্বেচ্ছায় যোগ না দেয়। আবার ভদ্রলোক সমাজ এত বিচিত্র সূত্রে গণিকা সম্প্রদায়ের সঙ্গে আবদ্ধ ছিলেন যে তাদের পক্ষে সরাসরি বেশ্যাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া সবসময় সম্ভব ছিল না। কলকাতার অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তিই বাড়ি ভাড়া দিতেন বেশ্যাদের। এছাড়াও ডাক্তার উকিল পুরোহিত প্রভৃতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেশাজীবীরাও বেশ্যাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। তাই ভদ্রলোক সমাজ মূলত এই সম্প্রদায়কে বেশ্যাপল্লি থেকে উচ্ছেদ করে শহরের প্রান্তে বহিষ্কারের জন্য চেষ্টা চালান। অর্থাৎ পেশাটির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক প্রশাসন ও ভদ্রলোক সমাজ পরস্পরের সহযোগী ছিলেন। 'চোদ্দ আইন' এই দুই অংশকে কাছাকাছি এনে দেয়।

'চোদ্দ আইন' জারি হবার পর এই আইন এবং তজ্জনিত উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে বটতলা থেকে বেশ কিছু পুস্তিকা বের হতে থাকে। লেখকদের বেশিরভাগই এই আইনকে দুহাত তুলে সমর্থন জানান, কেউ কেউ আইনের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। বেশিরভাগ লেখকই বেশ্যাদের দুরবস্থার অনুপুঙ্ক্ষ ছবি তুলে ধরেন, পাশাপাশি গণিকাসক্ত 'বাবু'দের দুর্গতি নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করতেও ছাড়েন না—বস্তুত বাবুরা এবার প্যাঁচে পড়েছেন, বেশ্যাবৃত্তি সাময়িকভাবে হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে—এই সম্পর্কিত উল্লাসই প্রধান হয়ে ওঠে। লক্ষণীয়, বইগুলির অধিকাংশের রচয়িতাই পুরুষ, তাদের জবানিতে বেশ্যাদের কণ্ঠস্বর কতটা অবিকল ফুটে উঠেছে—সে বিষয়ে সংশয় থাকলেও, বেশ্যাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া আতঙ্কের ছাপ কিছুটা হলেও পাওয়া যায় এখানে। যেমন ধরা যাক, অজ্ঞাতনামা লেখকের লেখা 'বাহবা চৌদ্দ আইন' পুস্তিকাটি (১৮৬৯)। এই বইতে গণিকা নিস্তারিণী সরকারি ডাক্তারের কাছে নিজের শরীরের পরীক্ষা দিতে গিয়েছিল। যে মেয়েটি প্রতিরাতে একের পর এক পুরুষের সামনে নিজেকে মেলে ধরে, সরকারি ডাক্তারের সামনে পোশাক খুলতে গিয়ে তার লজ্জা, আতংক, ঘৃণা, চোখের জল এক ভিন্ন তাৎপর্য পায় :

> চারিদিকে পেয়াদা পাক গিস২ করছে...ভয়ে আমার বুক গুর২ কত্তে লাগলো। মনে করি না জানি কি করে, আবার শুনচি নাকি আরকের টবে বসায় এই সকল ভাবনায় কাপড়ে ও কর্ম্ম (প্রস্রাব) করেছি। যদিও লজ্জাতে পরাণ যাচ্চে। তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন এসে বল্লে তোর ব্যামো আছে? আমি ভয়ে কাঁপতে২ বলিলাম, না।...একটি ভদ্রলোক (অল্প বয়েস বটে) নিকটে আসিয়া বল্লে ন্যাংটো হও। আমি চোক দুটিতে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। সে বার দুই বোলে আপনিই আমাকে ন্যাংটো কল্লে। আরপর আঁটকুড়ির ব্যাটা বলে, পা ফাঁক করে দাঁড়া। কি করি তাই দাঁড়াইলাম।...পা ফাঁক করে দাঁড়ালে হাঁটু গেড়ে বসে ঘেঁটে ঘুঁটে দেখলে।[৪৬]

আমরা বুঝতে পারি ডাক্তারি পরীক্ষার মোড়কে ঔপনিবেশিক প্রশাসন এই মেয়েটির শরীর এবং যৌনাঙ্গের উপর অনধিকার দখলদারি চাপিয়ে দিতে চাইছে। আর শিক্ষিত ভদ্রলোকের কাছে এই ঘটনা যুগপৎ কৌতুক ও সমর্থন আদায় করে নিচ্ছে।

প্রাণকৃষ্ণ দত্তের লেখা 'বদমাএস জব্দ' (৩১ মার্চ, ১৮৬৯) বইটিও চোদ্দ আইনের সমর্থনে লেখা। এই বইয়ের সবচেয়ে লক্ষণীয় দিক হল আইন জারির ফলে বেশ্যাবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ, ভদ্রলোক খদ্দেরদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ, বেশ্যাগমনের মতো অনৈতিক, পাপ কাজের নিরোধ—ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রশংসার সঙ্গে লেখক যুক্ত করে দিয়েছেন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি সম্পর্কে তাঁর ভয়-ভক্তি-শ্রদ্ধা। ঠিক যেভাবে কলোনির প্রজা তার নিজের উন্নতির সূচক হিসেবেই ঔপনিবেশিক শক্তির অধীনতা মেনে নেয় এবং পরাধীন থাকতে পেরে গর্ববোধ করে। এই বইটির ভূমিকার শিরোনাম—'ইংরাজ রাজনীতি'। যার শুরুতেই লেখক দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছেন :

'ইংরাজ গবর্নমেন্টকে কোটী কোটি ধন্যবাদ। ইঁহারা আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত স্থানে ২ প্রহরি, ডাকঘর, বিদ্যালয়, ঔষধালয়, বিচারালয় ইত্যাদি স্থাপন করিয়াছিলেন ও করিতেছেন এবং সময়ে সময়ে বিভিন্ন নিয়ম বদ্ধ করিয়া অহরহ আমাদিগের মঙ্গল চেষ্টাতেই বিব্রত রহিয়াছেন।...ইংরাজ গবর্নমেন্টের আইনগুলি অতিশয় উত্তম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইহাতে প্রজাদের অপকারের নিমিত্ত একটিও বর্ণ অঙ্কিত থাকে না কেবল শিষ্ট পালন ও দুষ্ট শাসন উক্ত নিয়ম সকলের উদ্দেশ্য।'[৪৭] এরপর 'আমাদিগের জননীস্বরূপ ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতেশ্বরী'-র প্রতি অকুণ্ঠ রাজভক্তি প্রদর্শন করেছেন লেখক। এই ইংলণ্ডেশ্বরী যে 'শ্বেত কৃষ্ণ সকল জাতির প্রতিই সমান স্নেহ করিয়া থাকেন এবং যাহারা তাঁহার শিষ্ট পুত্রগণের প্রতি অত্যাচার করে তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে বিধিমতে শাসন করিবেন'—সেকথা জানাতেও লেখক ভোলেনি। এ হল জ্ঞান-যুক্তির আলোয় উদ্ভূত ঔপনিবেশিক 'ল অ্যান্ড অর্ডার'-এর সর্বজনীনতার প্রতি কলোনির শিক্ষিত প্রজার অগাধ বিশ্বাস। কলোনির অনৈতিক পাপাচারী মানুষকে শায়েস্তা করার জন্যই এই আইনের উদ্ভব। লেখকের ভাষায় বেশ্যাসক্তরা আজ 'ভাবিতেছেন হায় কি হোল কেমন করেই বা থানায় বাপ পিতামহের নাম লিখাইব যদি না লিখাই তাহা হইলে এক প্রকার জিয়ন্তে মরা হইয়া থাকিতে হইবে কারণ পুরুষ হইয়া যদি বেশ্যালয় গমন ও ইয়ারকি না করি তাহা হইলে জীবনেই বা প্রয়োজন কি!'[৪৮]

তাই 'নিছক রাঁঢ়েরা জব্দ হবে না লোচ্চাদের জব্দ করবার জন্যই [এই আইন] হয়েছে এর নাম তো চোদ্দ আইন নয় বদ্‌মাএস জব্দ আইন'। এক বেশ্যাসক্ত পুরুষ অপর একজনকে বলেছেন—'ওহে আদতখানা জান এটা ছোট বিলেত কোরবে এখানে আর বাঙালি থাকতে দেবে না।' আমরা আগেই বলেছি এদেশে চোদ্দ আইন জারি হবার আগে ব্রিটিশ সরকার খোদ ইংল্যাণ্ডে একটি অনুরূপ আইন জারি করেন। সেই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করেন ব্রিটিশ নারীবাদী নেত্রী জোসেফিন বাটলার। বাঙালিদের দেশটা আদতে ছোট বিলেতে পরিণত হয়ে যাবে একথা বলার অর্থ, বিলেতের এক কাল্পনিক প্রতিরূপ তৈরি করা, যার ভিতর নেটিভ বাঙালির, পিছিয়ে থাকা অন্ধকারাচ্ছন্ন বাঙালির কোন প্রবেশাধিকার নেই। অর্থাৎ একজন নেটিভ লেখক এখানে 'বড় বিলাত'-এর সাপেক্ষে বানিয়ে তোলা এই 'ছোট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিলাত'-এর কাঠামোয় নিজের দেশের মানুষকেই 'অপর' হিসেবে ভাবতে চাইছেন। এবং এভাবে তিনি নিজেই নিজেকে 'অপরায়িত' করছেন। 'বদমাএস জব্দ'-র অন্তিমে সংযোজিত হয়েছে 'জনৈক কবি' রচিত একটি পদ্য, যার শেষ কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এরকম :

মাতালেরা রাত্রিকালে মদ নাহি পায়।
মৌতাতি মৌতাত বিনা হয় মৃতপ্রায়।।
কুলবতী পায় পতি সন্ধ্যার সময়।
মনের আনন্দে গায় ব্রিটিশের জয়।।[৪৯]

অর্থাৎ বঞ্চিত কুলবধূর যন্ত্রণা উপশমের একমাত্র উপায় ব্রিটিশ প্রশাসন। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের ফাটলের ভিতরেও অনায়াসেই ঢুকে পড়ছে এই ঔপনিবেশিক শক্তি। এর কুড়ি বছর বাদে ১৮৮৮ সালে অকার্যকারিতার অভিযোগে 'চোদ্দ আইন' প্রত্যাহার করে নেয় ব্রিটিশ সরকার। অর্থাৎ কুলবধূর 'মনের আনন্দ' চিরস্থায়ী হয়নি। সর্বাতিশায়ী ব্রিটিশ প্রশাসনের নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেও তা হওয়া সম্ভব ছিল না।

৮

যৌনতা, আগেই বলেছি, এক অন্ধকারাচ্ছন্ন ধূসর এলাকা। দরজা বন্ধ করে দেবার পর ভেতরে কী কী ঘটে, কীভাবে ঘটে—আমরা জানি না। জানি না বলেই বন্ধ ঘরের ভিতরের ক্রিয়াকলাপকে আমরা প্রতিমুহূর্তে বাইরে থেকে 'নির্মিত' এবং 'পুনর্নির্মিত করি। কতকগুলো বাঁধাধরা নৈতিক কোড-এর প্রচলিত ঘেরাটোপে তাকে বিশ্লেষণ করতে চাই, তার উপর বৈধতা/অবৈধতার ধারণা আরোপ করি। বলাই বাহুল্য আমাদের সমাজে, বন্ধ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে, ঘরবন্দী নারী-পুরুষের শরীরী ক্রিয়াকলাপকে ব্যাখ্যা করার প্রক্রিয়াও একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে। পাঠক, বুঝতেই পারছেন 'বন্ধ দরজা' কথাটা এখানে নিছক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আক্ষরিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়নি। সমাজে ঘটে চলেছে, সবাই সব জানে, অথচ যা প্রতিমুহূর্তে প্রত্যক্ষগোচর নয়, এমন একটি বিষয়কে বাইরে থেকে নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি-সংক্রান্ত আলোচনার সুবিধার্থে 'বন্ধ দরজা' কথাটা ব্যবহৃত হয়েছে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত আমাদের সমাজে নারী-পুরুষের শারীরিক ও মানসিক সম্পর্কের মূলত তিনটি গড়পরতা ধরন ছিল। প্রথমটি 'বৈধ' স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক, দ্বিতীয়টি 'অবৈধ' পরকীয়া সম্পর্ক এবং তৃতীয়টি সর্বব্যাপী বেশ্যা-খদ্দের সম্পর্ক। বৈধ স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের ভিতর যৌনতা, শরীর, যৌন আনন্দ পরিতৃপ্তির অবাধ পরিসর সেদিন ছিল না। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, 'অশিক্ষিত' স্ত্রী এবং 'শিক্ষিত' স্বামীর সম্পর্ক—প্রভৃতি কারণে অধিকাংশ বিবাহই ছিল 'অসম' বিবাহ। মানসিক সংযোগটুকু ঘটার ন্যূনতম সুযোগও সেদিন প্রায় থাকত না কোনও দম্পতির। ফলত, তারা খুব সহজেই একে অপরের ভিতর শারীরিক ও মানসিক তৃপ্তির উপকরণ খুঁজে নেবে—এরকম সম্ভাবনা প্রায় ছিল না বললেই চলে। তাই পুরুষ তার স্বাভাবিক যৌনস্ফূর্তির আকাঙক্ষা মেটাত হয় পরিবার বা পরিবার-বহির্ভূত 'অবৈধ' সম্পর্ক দ্বারা অথবা গণিকালয়ের নগদ যৌনতা তার অতৃপ্ত কামনাকে শান্ত করত। মেয়েদের অবস্থা ছিল আরও বেশি সমস্যাসঙ্কুল ও জটিল। পুরুষের মতো অতি সহজেই বহির্গামী হবার সুযোগ তাদের ছিল না বলে অধিকাংশ মেয়েকেই অবদমিত, অতৃপ্ত যৌনতার আগুনে পুড়ে মরতে হত আজীবন। কঠোর রক্ষণশীল পুরুষতান্ত্রিক সমাজ মেয়েদের মানসিক চাহিদাগুলো যেমন বোঝেনি, তেমনই তাদের শারীরিক আকাঙক্ষারও কোনও খোঁজ রাখতে চায়নি দীর্ঘদিন পর্যন্ত। অথচ বাল্যবিধবা, গৃহবধূ, অবিবাহিত গৃহস্থ মেয়েদের শারীরিক বাসনার সুযোগ নিয়ে তাদের যৌন উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতেও ছাড়েনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরুষেরা। অনেক মেয়েকেই একারণে 'কুলটা' বলে চিহ্নিত করা হত এবং তাদের পক্ষে সংসারে টিকে থাকা অসম্ভব হওয়ায় কুলত্যাগ করতে বাধ্য হত তারা। এদের অনেকেরই স্থান হত বেশ্যাপল্লিতে। বস্তুত উনিশ শতকের অসংখ্য কেচ্ছা পত্র-পত্রিকা ও প্রহসন-নকশা জাতীয় রচনায় বাঙালি সমাজে যৌন ব্যভিচারের যে ব্যাপক ছবি পাওয়া যায়, তা থেকে এটুকু অন্তত বোঝা যায় যে অবৈধ যৌনাচার সেদিনকার সমাজে একটা চালু পদ্ধতি ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হল উনিশ শতকের প্রথম দিকের বাঙালি সমাজে এই ধরনের যৌনাচারগুলি খোলাখুলি অনুমোদন না পেলেও এইগুলো নিয়ে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি অনেক বেশি হয়েছে। পরবর্তী সময়ে অখ্যাত-স্বল্পখ্যাত লেখকদের লেখা নকশা-প্রহসনে যৌনতা সংক্রান্ত উল্লেখ অনেক বেশি হলেও শিক্ষিত এলিট অংশ ভিক্টোরীয় নৈতিকতার তাড়নায় ক্রমশই যে কোনো ধরনের যৌন বিষয়কেই নৈঃশব্দ্যের অন্ধকারে চাপা দিতে শুরু করেন। ১৮৪৯ সালে প্রকাশিত 'সম্বাদ রসরাজ' পত্রিকায় এই ধরনের ফিরিওলা ও গৃহিণীর মিলন বৃত্তান্ত, বল্লভপুরের দ্বাদশ গোপাল দর্শন করতে গিয়ে কলকাতার কুলবধূরা কীভাবে সাধুদের সঙ্গে মিলিত হলেন, বাড়ির গৃহবধূ ও শাশুড়িদের সমকামিতার বৃত্তান্ত ছাপা হত। এই ধরনের কেচ্ছাপত্রিকার চল অনেকদিন অব্দি ছিল। কিন্তু কেবল পুরুষদের উদ্যোগে নয়, বাড়ির মেয়েরাও যে অতৃপ্ত কামনা চরিতার্থ করার হাজারো উপায় খুঁজে বের করছে—এক্ষেত্রে এটাই অনেক বেশি উল্লেখযোগ্য বিষয়। কারণ সামাজিক হায়ারার্কি যখন পুরুষের যৌন স্বেচ্ছাচার সম্পর্কে সহনশীল হওয়া সত্ত্বেও মেয়েদের যৌন অতৃপ্তি সম্পর্কে উদাসীন থেকেছে, তখন, হাজারো লোকলজ্জা, অপমান, সমাজচ্যুত হবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও মেয়েদের নিজস্ব যৌন পরিতৃপ্তির এই চেষ্টাকে পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যৌননৈতিকতার সাজানো কাঠামোয় এক ধরনের অন্তর্ঘাত হিসেবে দেখা যেতেই পারে। তারকচন্দ্র চূড়ামণির *'সপত্নী নাটক'*-এ স্বামীসঙ্গ বঞ্চিতা কুলীন কন্যা নিতম্বিনী তার অতৃপ্ত দেহমনের বাসনা প্রকাশ করলে বোন চঞ্চলা বড়দি কাদম্বিনীকে বলে ওঠে :

> 'দিদি, শুনলি, নিতু যেন এককালে ক্ষেপে উঠলো মা, ওর আগুন জ্বলে উঠেছে, ও আর থাকতে পারে না, ও মা। চেনা দায়।'[৫০]

এই নাটকেই মা হরমণি তার মেয়ে হরিপ্রিয়াকে শোনাচ্ছে নিজের গুপ্তজীবনের বৃত্তান্ত। কুলগুরুর সঙ্গে রাতের পর রাত ধর্মাচরণের অছিলায় হরমণি তার অতৃপ্ত দৈহিক বাসনা পূরণ করত। সে বলেছে

> 'তাঁর (গুরুর) মুখের পানে চেয়ে কত শাস্তরের কথা শুনি এত কি ঢলয়ে থাকি? কর্বো কি বল? ...আমরাও তো সব হল্যেম কুলীনের মাগ, স্বামী কেমন সামিগ্রী, কাল কি ধল ভাল করে চক্ষেও দেখিনি। আমরা কি আর পোঁদে কাপড় দিই না গা? না কাল কাটাই না?'[৫১]

'মাগ-সর্বস্ব' নাটকে পামর কোম্পানির ক্যাশিয়ার গণিকাসক্ত পুরুষদের উদ্দেশে বলেছে : 'আরে ব্যাটারা, তোরা রাঁঢ়ের বাড়িতে লোচ্চামি করতে যাস, সমস্ত রাত কাটিয়ে আসিস, বাড়িতে তোদের মাগকে ঠাণ্ডা করে কে? তারাও তো লোচ্চা খুঁজে বেড়ায়।'[৫২] 'জন্মভূমি' পত্রিকার মাঘ ১৩০১ সংখ্যায় প্রকাশিত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-র 'তমস্বিনী' গল্পে বালবিধবা শ্যামা পূর্ণযৌবনে পৌঁছে অন্যের মুখে অশ্লীল গল্প শুনে ও অশালীন যৌন আলোচনার মাধ্যমে নিজের বিকৃত কাম চরিতার্থ করত:

> 'গোপনীয় কথা বলিতে শ্যামা সকলের সেরা হইয়া উঠিয়াছিল। যে সব গান অতি কদর্য্য, যে সকল গল্প নিতান্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অশ্রাব্য সেই সকল গান ও গল্প বয়স্যদিগের নিকটে করিত। ইহা ভিন্ন অন্য কিছু আমোদ সে জানিত না।[৫৩]

রামনারায়ণ তর্করত্নের লেখা *'কুলীনকুলসর্বস্ব'* নাটকে বিবাহব্যবসায়ী কুলীন ব্রাহ্মণ অধর্মরুচি মুখোপাধ্যায় পুরোহিত ধর্মশীলকে বলেছে তার সবকটি বউকে সে সর্বদা সঙ্গদান করতে পারে না। ফলত, তার বিবাহিতা স্বামীবঞ্চিতা কুলীন বধূরা প্রায়ই অন্য পুরুষের সন্তান গর্ভে ধারণ করে। লোকনিন্দার ভয় এড়াতে তখন শ্বশুরবাড়ি থেকে টাকা খাইয়ে অধর্মরুচির মুখ বন্ধ করা হয়:

> অধর্ম। আমরা কুলীনের ছেলে, অনেকগুলো বে, সর্বত্র ত যাওয়া হয় না, তা যদি কোথাও বেঁধে যায়, আর নিকাশ প্রকাশ করা হয় না—বুঝতে পেরেছেন কি?
>
> ধর্ম। হাঁ বুঝিছি। তবে কি হয়?
>
> অধর্ম। তবে তারা লোকনিন্দে ভয়ে এসে আমাদের নে যাওয়ার চেষ্টা করে, আমাদেরও ঝোপ বুঝে কোপ, মটকা মেরে বসে থাকি। সুতরাং তারা ১০/২০/৩০ টাকা দিয়া লইয়ে যায়।[৫৪]

আমাদের প্রচলিত সাহিত্য সমালোচনায় উনিশ শতকীয় প্রহসন-নকশায় উল্লিখিত এইসব যৌন ব্যাভিচারের ছবিগুলিকে তৎকালীন অবক্ষয়ী জনসমাজে পুরুষের অন্যায় নিষ্ঠুরতা এবং শৃঙ্খলিত মেয়েদের উপর রক্ষণশীল পুরুষতান্ত্রিক নিপীড়নের কাহিনি হিসেবেই সাধারণত পড়া হয়। অবশ্যই এই দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক। কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টো দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এই কাহিনিগুলোকেই যৌন অবরোধের বিরুদ্ধে গৃহস্থ মেয়েদের অবদমিত শরীরের বিদ্রোহ হিসেবে পড়া যেতে পারে। অর্থাৎ এইসব ক্ষেত্রে লোভী পুরুষই কেবল মেয়েদের শরীর নিয়ে খেলছে না, অনেক ক্ষেত্রেই মেয়েরাও স্বেচ্ছায় অংশ নিচ্ছে ওই শরীরী খেলায়। এমনকি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামাজিক ভাবে একঘরে হয়ে যাবার ভয় ও চাপ অতিক্রম করে তারা এই বিপজ্জনক এলাকায় ঢুকে পড়ছে, অনেক সময় কোনো আগু-পিছু না ভেবেই। দরজার বাইরের পৃথিবীকে এভাবেই যেন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে বন্ধ দরজার নিজস্ব অন্ধকার। আর তাই, 'আলোকিত' শিক্ষিত এলিট ওই বন্ধ দরজার ভিতরেও অনুপ্রবেশ করলেন অচিরেই। মানবজীবনের কোনো অংশই আর যাতে সার্বভৌম যুক্তির শৃঙ্খল থেকে ফসকে যেতে না পারে, সে বিষয়ে, শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোক সম্প্রদায় তৎপর হয়ে উঠলেন উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই।

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়-এর লেখা '*ভ্যালারে মোর বাপ*' নাটকে নায়ক কলিরকাপ বৃদ্ধা সিঁদূরমাতাকে বলেছে যে, সে নিজে বেশ্যাবাড়ি যায় না। কিন্তু ঘরের ভিতর নিজের বৌকে বেশ্যার মতন সাজিয়ে সেই অতৃপ্ত বাসনা পূরণ করে সে :

> 'কলি। ... আমি বেশ্যালয়ে যাইনে। যারা বাউত্রে, তারাই খানকির বাড়ি গিয়ে টাকা নষ্ট করে। ঠান্‌দিদি তোমাকে বোলতে কি? তুমি কিছু কারো সাক্ষাতে বোলতে যাবে না। আমি আপিস থেকে আসবার সময় রাস্তার ধারে বারেন্ডায় খানকি বেটীরে যেমন কোরে সেজে বোসে থাকতে দেখি, ঘরে এসে তোমার নাতবৌকে ঠিক তেম্নি কোরে সাজাই।'[৫৫]

কিন্তু পারিবারিক গার্হস্থ্যজীবন থেকে এহেন কুরুচিকর অপবিত্রতাকে ঝেঁটিয়ে দূর করাই তো উনিশ শতকের শেষার্ধের শিক্ষিত এলিট বাঙালি চিন্তানায়কদের সাধনার বিষয়। আসলে ঔপনিবেশিক শিক্ষা সংস্কৃতির চেতনায় আলোকিত বাঙালি এলিটের মনে এসময় থেকেই গড়ে উঠতে থাকে আধুনিক 'সিভিল সোসাইটি' সংক্রান্ত ধারণা। এর অন্যতম লক্ষণ হিসেবে জীবনযাপনের 'পাবলিক' এবং 'প্রাইভেট' ক্ষেত্রদুটিকে আলাদা আলাদাভাবে আলোচনার বিষয়বস্তু করে তোলার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রয়োজন দেখা দেয়। কারণ 'আধুনিক' রাষ্ট্রের 'নাগরিক' হিসেবে শিক্ষিত ভদ্রলোক সেদিন কতকগুলো সর্বজনীন নীতিবোধের আদলে নিজেদের দায়-দায়িত্ব সাজিয়ে নিতে চাইছিল। কিন্তু কলোনির প্রজা হিসেবে যথার্থ আধুনিক রাষ্ট্রের স্বাধীন নাগরিক হয়ে ওঠার কোনোরকম সম্ভাবনাই প্রায় ছিল না তার সামনে। তাই প্রকাশ্য 'পাবলিক' এলাকা ছেড়ে সে নজর দিতে বাধ্য হল 'প্রাইভেট' এলাকায়। আধুনিক পাশ্চাত্য domestic science-এর ক্যাটেগরিগুলো আত্মসাৎ করে সে সাজিয়ে নিতে চাইল তার নিজস্ব গার্হস্থ্যজীবনকে। একদিকে সে যেমন যথার্থ 'আধুনিক' হবার তাড়নায় পাশ্চাত্য 'discipline', 'routine' ও 'order' জাতীয় ভিক্টোরীয় এষণাগুলোকে গ্রহণ করে তৈরি করতে চাইল নিজস্ব 'গার্হস্থ্য বিজ্ঞান' তেমনই আবার উদীয়মান জাতীয়তাবোধের প্রভাবে তার এই নিজস্ব 'গার্হস্থ্য বিজ্ঞান' নিছক পাশ্চাত্য ক্যাটেগরির দেশীয় সংস্করণ হিসেবেই সীমাবদ্ধ রইল না। তার নিজস্ব 'গার্হস্থ্য বিধি' গড়ে উঠল পাশ্চাত্য আধুনিকতা ও দেশীয় রক্ষণশীল হিন্দু ক্যাটেগরিগুলোর বিচিত্র সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে। তার এই নব্য গার্হস্থ্যভাবনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল 'গৃহবধূরা। যেহেতু ভবিষ্যতের কাল্পনিক নেশনস্টেটে'র ক্ষুদ্রতম একক হল পরিবার, তাই এই পরিবারের গৃহকর্ত্রীর উপর বর্তাল শিশুর স্বাস্থ্য-শিক্ষা-চরিত্র নির্মাণের দায়িত্ব। একই সঙ্গে স্বামীর যথার্থ ও যোগ্য সঙ্গিনী হয়ে ওঠার প্রয়োজনীয়তাও আরোপিত হল তার উপর। আর এর ফলেই জন্ম নিল আধুনিক 'নারীত্ব' বা womanhood সংক্রান্ত শিক্ষিত এলিটের নিজস্ব ধ্যানধারণা। জন্ম নিল নতুন দাম্পত্য ভাবনা। উনিশ শতকের শেষ ৪০ বছরে এসে নতুন পরিবার, গার্হস্থ্য, নারীত্ব সংক্রান্ত বিপুল সাহিত্য রচিত হয়েছে বাংলায়। আগেকার 'অশিক্ষিত' গৃহবধূর বদলে গৃহকর্মনিপুণ 'শিক্ষিত' গৃহবধূর প্রয়োজনীয়তা ছিল এর মূল উদ্দেশ্য, যাতে বাঙালির পরিবার-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংক্রান্ত পুরোনো 'অনাধুনিক' ধারণার বদলে এবার গড়ে ওঠে এক 'আধুনিক' যুক্তিবাদী ধারণা, যদিও এই যুক্তির স্বরূপ, আমাদের নিজস্ব সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলির প্রভাবে পাশ্চাত্য থেকে অনেকটাই আলাদা। একটি সাম্প্রতিক লেখায় দীপেশ চক্রবর্তী বিষয়টিকে ধরতে চেয়েছেন এইভাবে:

> The civilising discourse that propelled both imperialist and nationalist thought thus produced the figure of the 'uneducated housewife/mother as one of the central problems that the project of making Bengalis into citizen-subjects had to negotiate. The lack of books in bengali on the subject of 'domestic science' was now deplored by authors who came forward, with a sense of patriotic duty, to fill in this precieved void ... It was thus that the idea of the 'new woman' came to be written into the techniques of the self that nationalism evolved, which looked on the 'domestic' as an inseperable part of the 'national'. The 'public' sphere could not be erected without reconstruting the 'private'.[৫৬]

গোটা উনিশ শতক জুড়ে নক্‌শা-প্রহসন-পত্রপত্রিকায় বাঙালি পরিবারে ও সমাজে নারী-পুরুষের যৌন ব্যভিচারের যে বিপুল ছবি পাওয়া যায়, তার দশ শতাংশও যদি সত্যি হয়, তবে মানতেই হবে, পাশ্চাত্য শিক্ষা এদেশীয় এলিটের চৈতন্যকে পুরোপুরি আচ্ছন্ন করার আগে অব্দি, বাংলার সমাজে যৌননৈতিকতার গড়ন অনেকটাই অন্যরকম ছিল। 'সতীত্ব' এবং 'পাতিব্রত্য' সংক্রান্ত নৈতিকতার বাড়াবাড়ি, যৌনতাকে একধরনের পরিশীলিত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা—এগুলো উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ছিল না। নীরদচন্দ্র চৌধুরী দেখিয়েছেন :

> গার্হস্থ্যজীবনে স্ত্রীলোকের সতীত্ব ও পাতিব্রত্য এরকম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা মামুলি আচরণ বলিয়া ধরা হইত যে, উহা নরনারী সম্পর্কিত 'আইডিওলজি'র অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। পাশ্চাত্য প্রভাব আসিবার পর এই প্রাচীন হিন্দু ধারণাকে পাশ্চাত্য প্রেমের 'অ্যান্টিথিসিস' হিসাবে দাঁড় করানো হইয়াছিল। কামই যে নরনারীর সম্পর্কের মূল কথা ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা পূর্বযুগে আবশ্যক মনে হয় নাই।[৫৭]

বিষয়টা ব্যাখ্যা করার জন্য একটা ছোট্ট উদাহরণ দেওয়া যাক। 'সম্বাদ সুধাকর' পত্রিকার ৫ নভেম্বর ১৮৩১ সংখ্যায় কলকাতার জনৈক ভদ্রলোকের বাড়ির যৌন ব্যভিচারের সংবাদ ছাপা হয়। রাত্রিবেলা ওই বাড়ির কর্তা ও ছেলেরা বেরিয়ে যেত গণিকালয়ে রাত কাটানোর জন্য। সেই সুযোগে বাড়ির গৃহকর্ত্রী ও পুত্রবধূরা বাড়ি'র কর্মচারী ও চাকরদের অন্তঃপুরে ডেকে নিয়ে গিয়ে কামলীলা চরিতার্থ করত। লেখকের মতে :

'উপরি উক্ত বৃত্তান্ত পাঠ-করণান্তর অস্মদাদির ইংরেজ পাঠকেরা মনে মনে হাস্য করিয়া হিন্দুদিগের প্রতি তাঁহাদের ঘৃণা জন্মিলেও অসঙ্গত হয় না, তথাচ ঐরূপ রীতিচরিত্র এই রাজধানীর মধ্যে এতাদৃক চলিত হইয়াছে যে এক্ষণে প্রায় অনেক বিশিষ্ট লোকেরা ইহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবেন না।[৫৮]

অর্থাৎ এধরনের ব্যাপারস্যাপার তৎকালীন বাঙালি সমাজে আকছার ঘটছে এবং শুধু তাই নয়, লেখকের আক্ষেপ, ইংরেজি শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা ও খোদ ইংরেজরাও এধরনের ঘটনা শুনে বাঙালি হিন্দু সমাজের প্রতি ঘৃণায় নাক সিঁটকোবেন। এধরনের ঘটনাবলী 'শিক্ষিত', 'আধুনিক', 'আলোকপ্রাপ্ত' এলিট বাঙালির কাছে অনভিপ্রেত। তাহলে এর প্রতিকারের উপায় কি? লেখকের মতে যেহেতু এটা গৃহাভ্যন্তরের সমস্যা এবং গার্হস্থ্যজীবনের কেন্দ্রীয় চরিত্র নারী, তাই এদেশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অশিক্ষিত' নারীদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারলেই এই ধরনের যথেচ্ছাচারে মেয়েদের অংশগ্রহণ রোধ করা যাবে। লেখক বলেছেন :

> নারী জাতির মদন পুরুষাপেক্ষা অষ্টগুণ প্রবল (এইরূপ অনেকে কহিয়া থাকেন), তাহাতে অস্মদ্দেশের কঠিন রীত্যনুসারে বিদ্যারূপ যে জ্ঞান তাহা তাহারদিগের বঞ্চিত করাতে ঐ দুর্বার মদন অজ্ঞান অবলাদিগের উপর পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া তাহারদিগের কামানল উজ্জ্বল করিয়া যে তাহারদিগের অতি ঘোরতর দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত করাইবেক ইহাতে বাধা কি? আর ইহাতে যে তাহারদিগের সতীত্বও বিনাশ হইবে ইহারই বা অসম্ভাবনা কি আছে?[৫১]

এতদ্‌সত্ত্বেও যারা নারীশিক্ষার বিরোধী, তাদের ভর্ৎসনা করে লেখক প্রশ্ন করছেন—'উপরি উক্ত লম্পটাচরণ কেবল জ্ঞানাভাবেই হইয়াছে, কি তাহার আর কোনও কারণ আছে?' অর্থাৎ নারীশিক্ষা, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, নীতিবোধ, চরিত্রগঠন, জীবনের মহত্তর উদ্দেশ্যসাধন—এই দৃষ্টিকোণগুলি থেকে এবার বাঙালি এলিটের দাম্পত্যভাবনাকে পুনর্নির্মিত করার প্রয়োজন দেখা দিল।

এই নতুন দাম্পত্যভাবনার প্রধান স্থপতি ছিলেন ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীরা। সমাজ থেকে ব্যভিচার, বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক, বহুবিবাহ, গণিকাসক্তি প্রভৃতি যদি দূর করতে হয়, তবে দাম্পত্যজীবনে এইসকল বাহ্যিক আকর্ষণের বিষয়বস্তু অপেক্ষা 'উন্নত' এবং অধিকতর আকর্ষণীয় এক বাতাবরণ তৈরি করা প্রয়োজন—এ হেন ভাবনা থেকেই এই নতুন দাম্পত্যবোধের জন্ম। এই ভাবনার মূল কথাই হল দাম্পত্য কেবল বাহ্যিক সম্পর্কে যুক্ত দুটি নরনারীর সহাবস্থান নয়, স্বামী ও স্ত্রীর যাবতীয় পৃথক সত্তার অবলোপ ঘটিয়ে তাদের এক মন, এক আত্মা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Pavakrishnalahiri

২য় খণ্ড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ১২শ সংখ্যা।

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

চিকিৎসা-সম্মিলনী।

(চিকিৎসা-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা)

(২য় খণ্ড, ১২৯২ সাল।)

টাকীর বিখ্যাত ও সুশিক্ষিত জমীদার

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী বি এ,

মহাশয়ের বিশেষ উদ্‌যোগে

ডাক্তার শ্রীঅন্নদাচরণ খাস্তগির

ও

কবিরাজ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা,

৪২৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট শরৎ শশী যন্ত্রে

শ্রীহরিমোহন রায় দ্বারা

প্রকাশিত ও মুদ্রিত।

১৮৮৮।

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তোলাই হল বিবাহের মূল উদ্দেশ্য। নিছক বস্তুগত মিলন নয়, তারা এক উন্নত আদর্শবোধের তাগিদে গড়ে তুলবে এই অভেদাত্মক সম্পর্ক। 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় বিনোদিনী সেনগুপ্তার একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছিল :

> মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ধর্ম্মসাধন। বিবাহ দ্বারা মনুষ্য সেই ধর্ম্মসাধনের সহায়তা লাভ করে। ... বিবাহ দ্বারা দুইটি অপূর্ণ মানব পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়; উভয় মানবাত্মা একত্রীভূত হইয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে থাকে। দম্পতির প্রেম পবিত্র হইলে, তদুপরি ব্রহ্মাণ্ডপতির সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত থাকে। নিত্য তাঁহারা একাত্মা হইয়া ভগবানের পূজায় আত্মসমর্পণ করেন। ... চরিত্রবতী স্ত্রীর জীবনস্রোত পতির জীবনস্রোতের সহিত মিলিত হইয়া ঈশ্বরাভিমুখীন হইলে জগতে স্বর্গীয় জ্যোতি বিকীর্ণ করে। ফলতঃ দাম্পত্য জীবন বিশুদ্ধ ও প্রেমপূর্ণ হইলে এবং দম্পত্তির প্রেম পবিত্র প্রেমের আধার প্রভু ভগবানের উদ্দেশ্যে ধাবমান হইলে, জীবনের সুখ ও সৌন্দর্যের আর অবধি থাকে না।[৬৭]

বামাবোধিনী, মহিলা, পরিচারিকা, অবলাবান্ধব, বঙ্গমহিলা, অন্তঃপুর প্রভৃতি ব্রাহ্ম পত্রপত্রিকায় এধরনের অজস্র লেখা প্রকাশিত হয় এই পর্বে। লক্ষণীয় প্রায় সকল লেখক/লেখিকাই এই আদর্শ দাম্পত্যের প্রধানতম শর্ত হিসেবে স্বামী ও স্বামীর পরিবারের প্রতি গৃহিণীর নিঃশর্ত আনুগত্যের কথাই উল্লেখ করেছেন বারবার। এবং এক্ষেত্রে রক্ষণশীল হিন্দু মানসিকতার সঙ্গে তাঁরা প্রায় কোথাও আলাদা নন। পাশ্চাত্য ধরনে 'প্রেম', 'কোর্টশিপ' প্রভৃতি ধারণার বিকাশ ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই সতীত্ব ও পাতিব্রত্যকেও নতুন ভাবে তাত্ত্বিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল সেদিন। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভক্তি আমাদের সমাজে একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচলিত দাবি, কিন্তু উনিশ শতকের শেষদিকের লেখালেখিতে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভক্তি, আনুগত্য ও প্রেম এক নতুন তাত্ত্বিক আদর্শায়নের ছাঁচে নির্মিত হয়। নিছক 'গৃহদাসী' নয়, 'গৃহিণী'র কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় সর্বগুণসম্পন্না হয়ে স্বামীকে যাবতীয় প্রাত্যহিক স্থূল আকর্ষণ থেকে মুক্ত করা।

কিন্তু এই নতুন দাম্পত্যে যৌনতার স্থান কতোটা? ব্রাহ্মদের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল হিন্দু পরিবার থেকে যাবতীয় অপবিত্রতার অপসারণ। তাই হাজারো অন্যায়, মেয়েদের উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন সত্ত্বেও হিন্দু পরিবারের বৈধ-অবৈধ আকাঁড়া যৌনাচার, যৌনতা সংক্রান্ত কথাবার্তার যে প্রকাশ্য/গোপন অস্তিত্বটুকু ছিল, এই নতুন দাম্পত্যভাবনায় তার ছিঁটেফোটাও রইল না। নব্য ভিক্টোরীয় নৈতিকতার প্রভাবে এই নতুন দাম্পত্য থেকে যৌনতাকে যেন প্রায় নির্বাসনে পাঠানো হল। স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক সম্পর্ককে একধরনের নৈতিক বাউন্ডারি ওয়ালের ভিতর আটকে রাখাই এই সম্পর্কের প্রধানতম শর্ত। কারণ স্বামীকে উচ্চতর আদর্শের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য স্ত্রীকেও 'নীচ ইন্দ্রিয় সুখে'র কথা বিস্মৃত হতে হবে। সমাজকে যৌন কলুষতা থেকে মুক্ত করার প্রয়াসে সতীসাধ্বী গৃহিনী নিজেকে শারীরিক স্পৃহাশূন্য হিসেবে গড়ে তুলবে, স্বামী-স্ত্রীর যৌনসম্পর্ক যেটুকু থাকবে তা ও নিছক কর্তব্যের খাতিরে, মেয়েলি dialect-এর আদিরসাত্মক দিকগুলি সদাই বর্জনীয়, এমনকি হিন্দু বিবাহবাসরে প্রচলিত বদ রসিকতাও অশ্লীলতার পর্যায়ভুক্ত। স্বামীকে কর্তব্য সাধনের পথে এগিয়ে দেবার জন্য স্ত্রী নিজের শরীরিক সুখাভিলাষকে বর্জন করবে এমনটাই ভেবে নেওয়া হতে থাকে। অর্থাৎ শিষ্ট, শিক্ষিত সমাজে যৌনতা এক ঠান্ডা নৈঃশব্দ্যের এলাকায় স্থানান্তরিত হল।

'পরিচারিকা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'পতিব্রতা ও পাতিব্রত্য' নামক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রচনায় লেখক এই শারীরিক কামনাশূন্য আদর্শ গৃহিনীর স্বামীসেবার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন—'এই সেবার সঙ্গে যদি উচ্চ ধর্ম্মের যোগ না থাকে, তাহা যদি শারীরিক ও সাংসারিকভাবে হয়, তদ্দ্বারা পতির জীবনের উন্নতি ও কল্যাণ হওয়া দূরে থাকুক বরং প্রভূত অধোগতি ও অকল্যাণ হওয়ারই ভূয়সী সম্ভাবনা। পত্নীর এইরূপ সেবা শুশ্রূষায় পতি অধিকতর সংসারাসক্ত ভোগানুরাগী ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া উঠিতে পারেন।'[৬১] আর এই শারীরিক কামনা-বাসনাশূন্য দাম্পত্যসাধনা কতোটা ভয়াবহ হতে পারে, তার প্রমাণ ব্রাহ্ম প্রকাশচন্দ্র রায় ও অঘোরকামিনী দেবীর 'দাম্পত্যের ব্রহ্মচর্য' পালনের ইতিবৃত্ত। এই সাধনার বিবরণ পাওয়া যায় 'অঘোরপ্রকাশ' বইতে। প্রকাশচন্দ্র লিখেছেন

> আলিঙ্গন নিষিদ্ধ হইল। গলা পর্যন্ত স্পর্শ বন্ধ হইল। মুখ চুম্বনে সুখও হয় না, দুঃখও হয় না, এইরূপ হওয়া চাই। অভ্যাসে ইহাও হইবে।[৬২]

এরপর স্বামী-স্ত্রী মস্তক মুন্ডন করে একত্রে ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করেছিলেন। সমাজ সংস্কারের নিজস্ব প্রয়াস এবং পাশ্চাত্য নীতিবোধের সমন্বয়ে এভাবেই শিক্ষিত এলিটের মননে যৌনতার একটা নেতিবাচক চেহারা গড়ে উঠেছিল সেদিন।

৯

কিন্তু এইসব হাজারো লেখালেখি সত্ত্বেও বাংলার সমাজের একটা অতি ক্ষুদ্র শিক্ষিত অংশের বাইরে এই নব্য দাম্পত্য আদর্শের প্রায় কোনও প্রভাব পড়েনি। বাঙালি সমাজের বিরাট অংশ তখনও পরিবার-গার্হস্থ্য-স্বামীস্ত্রী সম্পর্ক বিষয়ে গতানুগতিক পুরোনো ধারাকেই বজায় রেখেছিল। শতাব্দীর শেষদিকে পৌঁছেও তাই দেখা যায় বাবু কলকাতার গণিকাবিলাসে কোনো সামান্যতমও ছেদ পড়েনি। পরিবার এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবার-বহির্ভূত যৌনব্যভিচার কোনও অংশেই কমেনি। 'সাধারণী' পত্রিকার একটি সংখ্যায় প্রকাশিত 'স্বামী বশীকরণ মন্ত্র' রচনায় লেখক আক্ষেপ করেছেন ··· 'লোকে স্ত্রী বর্ত্তমানেও পরনারীর নিকট গমন করে কেন? বোধহয় বারবিলাসিনীদের নিকট যে সকল আমোদ লাভ করে স্ত্রীর নিকট তাহা পায়না বলিয়া।'[৬৩] বস্তুত, শিক্ষিত অংশের মধ্যেও যে, গৃহে সতীসাধ্বী স্ত্রী (যার সঙ্গে কেবল পুত্রার্থে মিলিত হওয়া যায়) রেখে, ঘরের বাইরে কামকলা পটিয়সী গণিকাসম্ভোগের বিপুল চল ছিল, তা এসময়ের অসংখ্য নক্‌শা-প্রহসন থেকে বোঝা যায়।

বাবু কলকাতার গণিকাবিলাসের এক বিচিত্র ছবি ছড়িয়ে রয়েছে গোটা উনিশ শতকব্যাপী লেখা অসংখ্য খ্যাত-অখ্যাত নক্‌শা সাহিত্যে। একটু খুঁটিয়ে এই লেখাগুলি পাঠ করলে যৌনতার প্রকাশ্য অভিব্যাক্তির বিভিন্ন ধরন এবং তার প্রতি শিক্ষিত শ্রেণির মনোভাবের ধীর পরিবর্তনের ইঙ্গিত মেলে। আমরা এরকম তিনটি বইয়ের কথা আলোচনা করব। এগুলি হল : ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর *নববাবুবিলাস* (১৮২৫) ও *নববিবিবিলাস* (১৮৩১) এবং ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়-এর *আপনার মুখ আপুনি দেখ* (প্রথম খণ্ড ১৮৬৩)।

মনে রাখতে হবে এই বইগুলোর সবকটিতেই নগর কলকাতার গণিকাবিলাসের ছবি থাকলেও লেখকেরা কিন্তু কোনোভাবেই সেই বেশ্যা ও বাবুয়ানাকেন্দ্রিক দিনযাপনকে সমর্থন করছেন না। তাঁরা সকলেই এই বিপুল অর্থ-নারী-সুরা-বিলাসব্যসনের জীবনকে সরাসরি আক্রমণ করেছেন। অথচ এই জীবনযাপনের অনুপুঙক্ষ ছবি আঁকতে গিয়ে নিজেদেরই অজান্তে তাঁরা যেন ওই সমসাময়িক উচ্ছ্বাস ও আনন্দে ভরপুর খণ্ডিত জীবনের uninhibited চেহারাটা তুলে ধরেছেন। যখন ঘরের ভিতর হাজারো নিষেধ ও অবদমনের কড়াকড়ি, তখন, বাগানবাড়ি বা গণিকালয়ের নিভৃত পরিবেশে কোথাও যেন মুক্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুঁজত শৃঙ্খলিত শরীর। হাউইবাজি যেমন একবার জ্বলে উঠেই নিভে যায়, তেমনই লাগামছাড়া অপচয়ের মধ্য দিয়েও, অ-সংস্কৃত, মোসাহেব পরিবৃত, অর্ধশিক্ষিত, অনুপার্জিত অর্থে ধনী বাবুদের প্রশ্রয়ে সাময়িকভাবে হলেও যৌনতা হয়ে উঠত উৎসবের মতন। এ যেন এমনই একটুকরো পরিসর, যেখানে সামাজিক রক্ষণশীলতা, হাজারো বিধিনিষেধ, ট্যাবু সরিয়ে রেখে মিলিত হত নারী-পুরুষের শরীর। এই যৌনতা আকঁড়া, অ-মার্জিত, ভোগসর্বস্ব—অথচ ভীষণভাবেই জ্যান্ত। কেবল ধনীরাই নয়, বাবু কালচারের সূত্রে এই ভোগলিপ্সার জগতে জড়িয়ে পড়ত সমাজের বিচিত্র স্তরের লোকজন। যৌনতাকে কোনো একটি পরিশীলিত, বানানো দর্শনের মোড়কে হাজির করার চেষ্টা নেই এখানে। নেই কোনও প্রাক্-নির্ধারিত বাধ্যবাধকতা। শিষ্টজনের চোখে ঘৃণা উৎপন্ন করলেও এই বুদবুদভরা রঙীন মুহূর্তযাপনকে অস্বীকারও করতে পারেননি কেউই। সমাজসংস্কারকেরা এই সংস্কৃতির বিরোধিতা করে গেছেন প্রাণপণ। ধনী বাবুসমাজ যতদিন অর্থের জোর ছিল চালিয়ে গেছে এই ভোগ ও যৌনতার অফুরান উচ্ছ্বাস। কিন্তু জনসাধারণের কাছে নিষিদ্ধ কৌতূহলের বিষয় হলেও উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই এই দিনযাপন শিক্ষিত বাঙালির কাছে ক্রমশই অস্পৃশ্য এক 'পাপাচার' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেল।

ভবানীচরণের *'নববাবুবিলাস'* ও *'নববিবিবিলাস'* যেন উনিশ শতকের প্রথমার্ধের এই বিচিত্র বাবু কালচার ও বেশ্যাসংস্কৃতির এক অনুপুঙ্ক্ষ ম্যানুয়াল, এক অনিবার্য গাইডবুক। মদ, মোসাহেব এবং বেশ্যাবাড়ির পিছনে অপরিমিত টাকা খরচ করতে গিয়ে এক হঠাৎ-ধনী বাবুর নৈতিক অধঃপতন এবং সর্বনাশের নেতিবাচক ছবিই এঁকেছেন ভবানীচরণ, অথচ গণিকাবিলাসের নিষিদ্ধ উত্তেজনার আঁচ এমনভাবে পরতে পরতে জড়িয়ে আছে এই বইয়ের ন্যারেটিভের ভিতর, যে, মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়, লেখক নিজেও যেন কোথাও ওই উত্তেজনার প্রতি পারমিসিভ। অর্থাৎ ভবানীচরণের নৈতিক কণ্ঠস্বর, লেখক হিসেবে তাঁর নির্মোহ নিরপেক্ষতার অবস্থানকে মাঝে মাঝেই টলিয়ে গেছে *নববাবুবিলাস*-এর চরিত্ররা। যৌনতাও যে একটি পৃথক আনন্দের বিষয়, তারও যে নিজস্ব অ-আ-ক-খ রয়েছে, চতুর নৈপুণ্যে যে শিখতে হয় তার বর্ণমালা, ভবানীচরণের বর্ণনার নিজস্ব শৈলীকে অনুধাবন করলে এই বিষয়টি পরিস্ফুট হয়। এক ধূর্ত মোসাহেব তরুণ বাবুকে বুঝিয়েছে গণিকাবিলাসের রকমফের। সে বাবুকে বলেছে :

> 'বারাঙ্গনাদিগের সর্বদা ধনাদি দ্বারা তুষ্ট রাখিবা, কিন্তু যবনী বারাঙ্গনাদিগের বাই বলিয়া থাকে, তাহা সম্ভোগ করিবা, কারণ পলাও অর্থাৎ পেঁয়াজ ও রসুন যাহারা আহার করিয়া থাকে, তাহারদিগের সহিত সম্ভোগে যত মজা পাইবা এমত কোনও রাঁঢ়েই পাইবা না।[৬৪]

এবং এই সম্ভোগের ক্ষেত্রে ঠুনকো নৈতিকতার পিছুটান যেমন অবাঞ্ছিত তেমনই হাস্যকর—'যদি বল যবনী বেশ্যা গমন করিব ইহাতে পাপ হইবেক তাহা কদাচ মনে করিবা না। সুখজনক কর্ম্ম করিলে যদি পাপ হইবে তবে কি শ্রী শ্রী ঁসুখসাধন ইন্দ্রিয়কে সুখজনক কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেন? শ্রী শ্রী পরম ঁদয়াল তিনি তাবৎ ইন্দ্রিয় সৃষ্টি করিয়া সকল ইন্দ্রিয়কে সুখ নিমিত্ত আপন আপন কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন। ...আর যাহাদিগের পূর্বজন্মে অনেক তপস্যা থাকে তাহারাই উত্তম স্ত্রী সম্ভোগ করে, অল্প তপস্যায় উত্তম স্ত্রী সম্ভোগ হয় না, যদি বেশ্যাগমনে পাপ থাকিত তবে কি উর্বশী, মেনকা, রাম রম্ভা, তিলোত্তমা প্রভৃতি বেশ্যার সৃষ্টি হইত?'[৬৫] গোটা বাবু কালচার যেন এই উক্তির মধ্য দিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছে, যেখানে বারবার জোর দেওয়া হচ্ছে ইন্দ্রিয়সেবা, সুখানুভূতির উপরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরপর এই পরামর্শদাতা মোসাহেব, 'লম্পট ব্যক্তি'র চরিত্রাঙ্কণ করেছে ত্রিপদীর মধ্য দিয়ে। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে 'লম্পট ব্যক্তি' বলতে সামাজিক দায়দায়িত্বে অনীহ, আত্মসুখসর্বস্ব, ঢিলেঢালা মানসিকতার যে টাইপকে বোঝানো হত, এখানে তারই ব্যাখ্যা রয়েছে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে সমাজ তাদের সম্পর্কে পারমিসিভ-ও ছিল। কারণ অভিজ্ঞ, ধূর্ত, কূটবুদ্ধিসম্পন্ন সংসারী মানুষের চেয়ে তাদের হৃদয়বৃত্তি অনেক বেশি প্রবল—এমনটাই ভাবা হত :

লোকে যারে বলে লুচ্চ সে কেবল জানিবা তুচ্ছ
লুচ্চ বিনা মজা জানে নাই।
মারে মন্ডা আদা ছেনা সদা থাকে বাবুআনা
সোনাদানা তুচ্ছ তার ঠাঁই।।
মাতা পিতা দাদা ভাই কাহার তোয়াক্কা নাই
দুঃখী নাহি হয় কার দুখে।
কেহ যদি কটু বলে সে কথা না গায়ে তোলে
সর্বদা সরল কথা মুখে।।...
যার সঙ্গে কোন ঠাঁই কোন কালে দেখা নাই
যেন কত আলাপন আছে।।...
লুচ্চ হলে দাতা হয় কাহারো না করে ভয়
কেবল প্রেমের বশ রয়।
যে জন পিরিতে রাখে তার প্রেমে বন্দী থাকে
তার জন্য বহু দুঃখ পায়।।...
নাহি ভাবে পূণ্য পাপ শরীরে না দেয় তাপ
শোকে তাপ নাহিক যাতনা।।...

এখানে বারবার জোর দেওয়া হচ্ছে সুখানুভূতির উপর, অর্থাৎ যৌনতার উপযোগিতাবাদী বা ইউটিলিটেরিয়ান ব্যাখ্যা এখানে প্রধান হয়ে উঠছে না:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে গিয়া বেশ্যাবাজি যদি বল কর্ম্ম পাজি
মন শুচি হলে পাজি নয়।
যাহার যাহাতে রুচি সেই দ্রব্য তারে শুচি
তার তাতে হয় সুখোদয়।।...
অন্য অন্য সুখের সৃষ্টি করি বিধি পরে মিষ্টি
করিলেন সুখের সৃজন।
বেশ্যাকুচ বিমর্দ্দন যতনেতে আলিঙ্গন
আর তার শ্রীমুখ চুম্বন।।...[৬৬]

বাগানবাড়িতে মোসাহেব পরিবৃত হয়ে বাবুর গণিকাসম্ভোগের এক সুবিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায় এই বইতে। মদ-উত্তম খাদ্যের প্রাচুর্য-নারী সবমিলিয়ে তা যেন এক উৎসবের চেহারা নেয়, জাতি নির্বিশেষে 'হিন্দু মোছলমান বেশ্যা সাধারণ তাবতেই নির্মলান্তঃকরণে একাসনে বিবিধ মদ্য মাংস প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য ভক্ষণ করিলেন...'[৬৭] এরপর :

কেহ বেশ্যামুখ চুম্বনে কেন আলিঙ্গনে কেন স্তনমর্দনে
কেন বলে তয়ফাওয়ালি কি মজা দিলি
এইরূপ খুশীতে স্বদেশী বিদেশী সকলেই নববাবুর মনোভিলাষ
পূর্ণ করিলেন।
এইপ্রকার রাগরঙ্গে দিবারাত্রি গত হইলে প্রভাতে তাবতে
স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।[৬৮]

অপরিমিত অপচয়ের ফলে বাবু অচিরেই নিঃস্ব হয়ে পড়লেন। আখ্যানের শেষে তার দীর্ঘ বিলাপোক্তি জুড়ে দিয়েছেন ভবানীচরণ। তার একটি অংশ খুবই মজার। বাবু কোনওদিন নিজের স্ত্রীর সঙ্গে রাত কাটান নি অথচ তার পাঁচটি কন্যা জন্মেছে এবং তাদের বিয়ের ভারও নিতে হচ্ছে বাবুকেই—'হা বিধাতা একদিবস স্ত্রী সহিত বাস করিলাম না তথাপি আমার হল যাতনা, পরে করে গেল সুখ আমার ভাগ্যে ছিল দুখ'[৬৯]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'নববিবিবিলাস' যেন পূর্বোক্ত *'নববাবুবিলাস'*-এর পরিপূরক বই। মাত্রাতিরিক্ত বিলাসব্যসন যেমন নববাবুর জীবনে সর্বনাশা পরিণাম ডেকে এনেছিল, বাহ্যিক জগতের সুখসম্ভোগের আকর্ষণ তেমনই ধ্বংস করেছিল সেদিনের কোনও কোনও নববিবির জীবন। এরকমই এক কুলত্যাগী গৃহবধুর জীবনকাহিনি বিবৃত হয়েছে এই বইতে, যার জীবনের ঘটনাপর্যায় ধরা রয়েছে সূচনার এই দুই পঙ্‌ক্তিতে 'অগ্রে বেশ্যা পরে দাসী মধ্যে ভবতি কুট্টিনী/সর্বশেষে সর্বনাশে সারং ভবতি টুক্কনী।' ঠিক কোন্ কোন্ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সে যুগের মেয়েরা কুলত্যাগ করতে বাধ্য হত, বেশ্যাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করত ও শেষাবধি তাদের অধিকাংশের পরিণতি কী হত, তার এক জীবন্ত বিবরণ এই বইটি।

লেখক প্রথমেই জানাচ্ছেন বাবুদের বারাঙ্গনাসঙ্গ এবং স্ত্রীর প্রতি অমনোযোগের কারণেই কুলবধূরা অতৃপ্ত দেহমনের আকাঙক্ষা মেটাবার তাগিদে অন্য পুরুষ খুঁজে নিত :

> 'যে সকল বাবু সর্বদা বেশ্যাবাস করেন... অন্তঃপুরে তাহার কামিনী আপন নিত্য সুখদায়ক প্রেমবিলাসক অন্য কোন নায়ক লইয়া সেই প্রতিনিধির দ্বারা বাবু গুণনিধির ভার লাঘব করেন। যেহেতু কেবল পোষণেরই ভার তাহার প্রতি, অন্য ভার অন্যের প্রতি, কিন্তু অধিকন্তু চমৎকার এই যে প্রাতে ঐ কামিনী স্বামী বাবুর পোষার মত গোঁসা না করিয়া অম্লান বদনে সংসারের কর্মকার্যে ধৈর্যতা দেখান... বিশেষত স্ত্রীলোকেরা কেবল নামেই অবলা, কিন্তু কামবলে পুরুষাপেক্ষা অতি সবলা...'[৭০]

এখানে যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হল ঘরের মধ্যে স্বামীর সঙ্গে চরম বিযুক্তি বহন করেও মেয়েটি জীবনের শূন্যতা পূরণ করছে পরপুরুষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে মিলিত হয়ে এবং সেই মেলামেশা কেবল নিরামিষ মেলামেশা নয়। বাইরে থেকে তার দৈনন্দিন জীবন এতটুকু টোল খায়নি অথচ ভিতরে ভিতরে ঐ পারিবারিক ডেকোরামের নিশ্চিন্ত নিয়মনীতিকে চূড়ান্তভাবে সাবোতাজ করছে সে। এই ঘটনাগুলোকে কেবল নারীর অসহায়তার সুযোগ নিয়ে লোলুপ পুরুষের আগ্রাসী ভূমিকা হিসেবে পড়া একপেশে হবে। কারণ এখানে মেয়েরা নিজেরাই ব্যভিচারে অংশ নিচ্ছে। এরপর লোকজানাজানি, স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রহার ইত্যাদি রুটিনমাফিক ঘটনা ঘটে যাবার পর :

> অনন্তর একথা ক্রমে পাড়ায় প্রকাশ পাইলে যে সকল বাবুরা কুলবধূসম্ভোগ অধিক সুখভোগ বোধ করেন তাঁহারা চেষ্টা পাইয়া থাকেন; কোন বাবু আপন আশার সুসারহেতু ঐ কামিনীর নিকট দূতী প্রেরণ করেন...[১১]

এবং দূতীর সহায়তা নিলেও অধিকাংশ মেয়েই যে স্বেচ্ছায় কুলত্যাগ করত, তাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন ভবানীচরণ। এই পারিবারিক হায়ারার্কি ভেঙে ফেলার মধ্যেও শরীর এবং মনের বন্ধনমুক্তির আকাঙক্ষাই সর্বপ্রধান অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে :

> এমত কোন কোন কামিনী স্বামীর জ্বালায় জ্বলিতাঙ্গ হইয়া, কেহ বা অন্য কোন বিষয়ের আশয়ে ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া, কেহ বা সুখেচ্ছায় নির্ভর করিয়া অর্থাৎ বেশ্যারা বড় সুখী, ইহারা স্বয়ং সংসারের কোন কর্ম কার্য করে না, স্বচ্ছন্দ পরমানন্দে পুরুষের ইচ্ছামত আহার বিহার পূর্বক যথেচ্ছাচার করিতে পারে এবং প্রেমাধিনী হয়েন এই ক্ষণিক কাল্পনিক সুখে সুখ জ্ঞান করিয়া কূলে কালি দিয়া ফুলের বাহির হয়েন।[১২]

এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়—হোক কাল্পনিক, তবু মেয়েটি যার আকর্ষণে ঘর ছাড়ছে, তা হল আদি ও অকৃত্রিম 'সুখানুভূতি' এবং বাবুর স্বয়ং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেমাধিনী হবার আকাঙক্ষার মধ্য দিয়ে কোথাও তার নিজস্ব সত্তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, যে মর্যাদা সে ঘরের ভিতর কখনও পায়নি।

'যৌবনোপক্রমে ক্রমে ক্রমে মদন রাজার রাজ্যরূপ নারী শরীরে যৌবন দূত প্রবিষ্ট অশান্ত দুর্দান্ত রাজার আগমন সংবাদ সংঘোষণ করাতে যুবতীর মনোরূপ প্রজাশাসনাভয়ে অধৈর্য্য হয়'[৭৩]—এহেন অকপট ঘোষণার পরই পাই নববিবির প্রতি নাপিতিনীর মন্ত্রণা :

অতএব বলি শুন কি কহিব পুনঃ পুনঃ
ত্যজ শীঘ্র এই শঠ নিপট লম্পট
নতুবা বিষম খেদ সদা হবে মর্মভেদ
সতীত্ব রাখিয়া মাত্র দুঃখ হবে সার...
নানা রস তুমি ধর রসিকের সঙ্গ কর
সার্থক হইবে তবে যৌবন তোমার ।...
ভাবিয়া কলঙ্ক ভয় যে নারী কূলেতে রয়
তার ভাগ্যে কোথা হয় এ সুখ সম্পদ।...[৭৪]

পরিবার ও অনড় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিজস্ব চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নববিবি যখন নাপিতিনীকে বলে 'দেখ স্বামীর এই দশা, তাহাতে আবার যদি গোপনে এদিক ওদিক কোনদিক চাই তখনই ঘরে পরে গুরুজনের গঞ্জনায় প্রাণ বাঁচে না; বাটীর রসুয়্যা, ব্রাহ্মণ কিম্বা জলতোলা ভারী অথবা কুটুম্ব লোকজন কাহারো সঙ্গে কালে ভদ্রে পিত্তরক্ষার নিমিত্ত আলাপ করিলে অভাগা মাগীগুলা কতই কয়, এত কি প্রাণে সয়, যেমন পাপিষ্ঠ ভাতার তেমনই তার আর ভাত খাইব না, এবং গুরুজনেও যে প্রকার ভর্ৎসনা করে তেমনি তাহাদিগকেও আক্কেল দিব...'[৭৫] তখন ঐ ক্ষমতাকাঠামোয় অন্তর্ঘাতের ধারণাটিই যেন প্রকট হয়। এরপর নববিবি ঐ নাপিতিনীর সহায়তায় কুলত্যাগ করে।

'পল্লীগ্রামস্থ কপট লম্পট বাবু'কে নাপিতিনী যখন নববিবির শরীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্ণনার ছলে নারীশরীরের এক চমকপ্রদ কাব্যিক বর্ণনা দেয়, তখন সেই বর্ণনার মধ্যে ঢুকে পড়ে উনিশ শতকের বাবুকালচারকেন্দ্রিক সামাজিক ইতিহাসের হাজারো টুকরো। পয়ারে বর্ণিত এই কবিতাটি চমকপ্রদ, যেন প্রায় পর্নোগ্রাফিক বর্ণনার মতই অথচ তার ভিতর এক আশ্চর্য রসমাধূর্য রয়েছে। যৌনতা যেন একটা রোমাঞ্চকর খেলা আর শরীর সেই খেলার পিছল বিচরণক্ষেত্র, যেখানে শিকারীর ধূর্ততায় পা ফেলতে হয়, সেই শরীরের কথা বলতে গিয়ে উনিশ শতকের প্রথম দিককার সমাজের প্রচলিত যৌন কথনভঙ্গির অচেনা ছবি ভেসে ওঠে। কুলকামিনীর শরীর এখানে যৌন রোমাঞ্চ উপভোগের নতুনতম অনাঘ্রাত এলাকা:

সুখের প্রয়াসে তুমি রসিক নাগর।
বৃথা কর পর্যটন নগর নগর।।
কুলকামিনীর অঙ্গে কর নিরীক্ষণ।
সকল সুখের স্থান হবে নিরূপণ।।

এরপর সরাসরি স্ত্রী অঙ্গের বর্ণনা এবং এই বর্ণনা ক্রমশ নারীশরীরের উপর থেকে নীচের দিকে নামছে:

নগরের মধ্যে এক কলিকাতা সার।
প্রতি পথে কত শত মজার বাজার।।
কিন্তু দেখ অঙ্গনার অঙ্গসহকার।
বুকে দুই কলিকাতা অতি চমৎকার।
এ কলিকাতায় সবে দেয় রাজকর।
সেইস্থানে রাজাকেও দিতে হয় কর।।

লেখক এবার নারীর গোপন অঙ্গের রহস্য এবং সেখানে পুরুষাঙ্গের অনুপ্রবেশের ইঙ্গিত দেন :

অপূর্ব নগর দেখ যার নাম ঢাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিল্পবিদ্যা সেইখানে কত আঁকা বাঁকা।।
কি দেখেছ রসরাজ এ কোন নগর।
রমণীর অঙ্গে আছে ত্রিকোণ নগর।।
তাহাতে গমন ছলে সুখচর হয়।
তাহার সমান এই সুখচর নয়।।

অবশেষে নারীর গোপনতম clitoris-এর বর্ণনা:

কিন্তু নারী ইচ্ছাপুর দেখা বড় শক্ত।
ইচ্ছাপুর সদা থাকে তাহাতে অব্যক্ত।।
অমৃতসরের সৃষ্টি সে অমৃতস্বরে।
রণজিত পঞ্চশর তাহে বাস করে।।[৭৬]

নববিবি পুরোপুরি বেশ্যায় পরিণত হয়। তাকে বিবিধপ্রকার গানবাজনা ও নাচের তালিম দেবার বিশ্বাস্য বর্ণনা দেন লেখক। এই বর্ণনার অনুপুঙক্ষ দিকগুলি বেশ্যাসংস্কৃতির সঙ্গে লেখকের অন্তরঙ্গ পরিচয়কে যেমন মেলে ধরে, তেমনই নিষিদ্ধ এলাকার এই সার্বিক উন্মোচন এমন এক খোলামেলা দৃষ্টিকোণের পরিচয় দেয়, যা উনিশ শতকের শেষদিকের এলিট মানসিকতার কাছে পুরোপুরি ব্রাত্য হয়ে গিয়েছিল। নববিবিকে এক বাঈজি বাড়িতে গণ্যমান্য নাগরিকদের সামনে হাজির করা হয়। এই আসরের বিস্তৃত বর্ণনা দেন লেখক :

> সে স্থানে সকল প্রাচীন লোচ্চা মহাশয়েরা কাহারো গোঁপ ও চুলে কলপ, কাহারো দন্ত বান্ধানো, কেহ চশমা ব্যতিরেকে দেখিতে পায়েন না এইরূপ প্রাচীন প্রাচীন লোচ্চারা বালকের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছিলেন।[৭৭]

যৌনতা এবং পর্নোগ্রাফি সম্পর্কে প্রচলিত একধরনের উদারনৈতিক মতামতের উল্লেখ করতে গিয়ে এক সাম্প্রতিক গবেষক বলেছেন 'In pornography, the world of pure fantasy, unrepressed desire

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

is allowed full and free play, social taboos and strictures are transgressed and subverted by unmediated sexual impulse, all signifiers are, systematically stripped of socially-determined parasitic signifieds and authoritorian rationalism[৭৮]—ভবানীচরণের উপরোক্ত বর্ণনার সঙ্গে এই দৃষ্টিকোণের মিল পাওয়া যাচ্ছে না কি?

'নববিবিবিলাসে'র সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ বৃদ্ধা বেশ্যা কর্তৃক নতুন ব্যবসায় নামা নববিবিকে বাবুদের পরিতৃপ্তিদানের উপযোগী 'কসবের রীতিনীতি'র শিক্ষা দেওয়া। 'তুমি কুলবধূ ছিলে..এক্ষণে নহে, যেহেতুক এক্ষণে তুমি বেশ্যা হইয়াছ, অতএব বেশ্যারদিগের আচার করিতে হইবেক'।[৭৯] একথা বলার পর 'বিবির মাতা' বিবিকে হাতে কলমে যৌনশিক্ষা দিতে চান। বলেন :

> যদ্যপি কথায় না বুঝিয়া থাক অদ্য আড্‌ডিজী আইলে তৎকালীন একবার আমার নিকটে আসিবা, বিহারের যে যে সকল ধারা কথায় কহিয়াছি তাহা সমস্ত স্বচক্ষে দেখিয়া শিখিবা। লেখক কহে, ভালই, সে শিক্ষা মুখে বলা অপেক্ষা দেখাই উচিত।[৮০]

অতঃপর উন্মুক্ত যৌনক্রিয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে নববিবিকে যৌনশিক্ষা দেওয়া হল : 'দিবসেই সাবকাশক্রমে আড্‌ডিজীর উপলক্ষে নববিবিকে বিবিধ বন্ধনে সকল বন্ধ দেখাইলেন, তাহাতে নববিবি চতুঃষষ্টিপ্রকার বিহারবিদ্যায় বিলক্ষণ বিচক্ষণা হইলেন।'[৮১]

বাবুর সঙ্গে নববিবির সম্পর্ক বস্তুগত, টাকাপয়সার। বাবুকে কাবু করার জন্য নববিবিকে শিখতে হয় ছয় 'ছ কারের' পন্থা—ছলনা, ছেনালি, ছেলেমি, ছাপান, ছেমো, ছেঁচড়ামি।[৮২] 'ছলনা' বলতে বোঝায় মিথ্যা অভিনয় করা, যেমন সমস্ত অলংকার মা আটকে রেখেছে—এই মিথ্যা কথা বলে বাবুর কাছ থেকে অতিরিক্ত অলংকার আদায় করা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ছেনালি' বলতে বোঝায় পরপুরুষের প্রতি আসক্ত নারীর ইচ্ছাকৃত কপটতা, যেমন আগে চলে পিছনে তাকানো, ইচ্ছাকৃত ভাবে কাপড় সরিয়ে শরীরের খানিকটা অংশ অনাবৃত করা, অকারণে আমোদ প্রমোদ করা, রসালো বাক্য বলা, শ্লেষাত্মক ব্যঞ্জনার ব্যবহার ইত্যাদি। 'ছেলেমি' বলতে বোঝায় বয়স বেড়ে গেলেও কচি বালিকার মত হাবভাব করা, 'ছাপান' বলতে বোঝায় এক বাবুর রক্ষিতা থাকা অবস্থাতেই সুকৌশলে ও সংগোপনে অন্য বাবুদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করা, 'ছেমো' হল 'ছাপান'-এর ফলে উদ্ভূত 'বাবু'-র রাগ কৌশলে শান্ত করা, প্রথমে অনুনয় শেষে নিজে রাগ দেখিয়ে বাবুকে বশে আনা, আর 'ছেচড়ামি' বলতে বোঝায় ইতর স্বভাব, বাবুর কাছ থেকে কাজ শেষ হবার আগেই টাকা আদায়ের ফিকির—'আসিবেন যে যে বাবু ঠিকা বেড়াইতে/আগেতে চাহিবে টাকা হাসিতে হাসিতে'—এই ছয় 'ছ কার' যেন উনিশ শতকের কলকাতার নব্য 'কামসূত্র'-র সংক্ষিপ্তসার।

বাস্তবে যা ঘটত, এই বইয়ের নববিবির জীবনেও তাই ঘটেছিল। অর্থাৎ নিষ্ঠুর গণিকাজগতের নিজস্ব নিয়মেই চূড়ান্তভাবে এক্সপ্লয়টেড হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে, চরম দারিদ্র্যের মধ্যে শেষ দিনগুলো কাটাতে হয়েছিল নববিবিকে। কিন্তু এই আলোচনায় যৌন ব্যবসার সেই অন্ধকার রাজনীতি বা এক্সপ্লয়টেশনের শোষক চরিত্রকে ধরতে চাইছি না। দেখাতে চাইছি উনিশ শতকের প্রথমার্ধের এক সামাজিকভাবে সফল ও প্রতিষ্ঠিত লেখক ভবানীচরণও বেশ্যাসংস্কৃতির ছবি আঁকতে গিয়ে, সমাজ সংস্কারের তাগিদে কলম ধরেও, যৌনতার প্লেজার প্রিন্সিপলকে অস্বীকার করছেন না, যা উনিশ শতকের শেষ দিকে পৌঁছে একজন সুপ্রতিষ্ঠিত মানী লেখকের পক্ষে আর সেভাবে করা সম্ভব হবে না। যে সরস ভঙ্গিতে ভবানীচরণ রমণীর স্তনবৃন্তের বর্ণনায় এক অনবদ্য ভাষা ব্যবহার করে লেখেন—'যেহেতু স্ত্রীলোক ত্রিলোক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জয় করিয়া থাকেন তাহার সাক্ষী প্রথমে যখন পয়োধর গাত্রোত্থান করেন তখন ঊর্ধ্বমুখী হয়েন, তাহার তাৎপর্য এই যে উর্দ্ধে স্বর্গস্থ সুরাসুর সকলকে দমন করেন পরে মধ্যবিৎভাবে কিছুকাল স্থায়ী হয়েন তাহাতেই মর্ত্ত্যলোক জয় হয় .... ইদানীং প্রাচীনাবস্থায় যদ্যপি পয়োধর নিম্নমুখী তথাপি ইহা দেখিয়া রসিকেরা সুখী ব্যতীত দুখী নহেন...'[৮৩], তা পরবর্তী কালের শিষ্ট সাহিত্যে আর সেভাবে দেখা যাবে না।

এর তিন দশক বাদে লেখা হয় ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়-এর *আপনার মুখ আপুনি দেখ* (প্রথম খন্ড, ১৮৬৩)। সামাজিক জীবনে অসংখ্য পরিবর্তন ঘটে গেছে ততদিনে। শরীর-যৌনতা সংক্রান্ত শিক্ষিত এলিটের ভাবধারাতেও বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু ভবানীচরণের গৃহীত বিষয়গুলো ভোলানাথেরও উপজীব্য—অর্থাৎ হঠাৎ ধনী 'বাবু' কালচার আর তাদের অপরিমিত মদ্যপান-বেশ্যাপ্রীতি। ভোলানাথ প্রথমেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যেই তাঁর কলম ধরা—'আবকারি অসভ্যতা, বেশ্যা, অয্যাচার, যথেচ্ছ আহার অপব্যয়, উঁচু চাল... প্রভৃতি কয়েক দোষে এ দেশ উচ্ছন্নে যাচ্চে'।[৮৪] আবার নকশা লেখকের নিরপেক্ষ নির্লিপ্তিও তিনি ধরে রাখতে চাইছেন কোথাও কোথাও— 'ভয় হয়, মদের ও বেশ্যার নিন্দা কোল্লে, কিম্বা উচিত কথা বোল্লে, তেমনি ২ মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকেই ক্রোধে অগ্নিশর্মা হোয়ে উঠেন, রাত্রে গলাটা টিপে ধরলে কি কোরবো?.... দুর হুকুগে? ও বিষয়ে আর বোলবো না? যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাই করুক...'[৮৫] তবে লেখক হিসেবে ভোলানাথের মুন্সিয়ানা অবশ্যই ভবানীচরণের তুল্য নয়, ভবানীচরণ যে অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে এক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করেছেন, ভোলানাথ তা করেন নি, তাঁর উদ্দেশ্যও ছিল না তা।

কিন্তু বাবু কালচারের মদ-বেশ্যা-মোসাহেব সংস্কৃতির বর্ণনায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভবানীচরণের সঙ্গে ভোলানাথের প্রধান পার্থক্য হল—ভোলানাথের কাছে যৌনতার প্লেজার প্রিন্সিপল খুব বড়ো হয়ে দাঁড়ায়নি। তাঁর সমকালকে আঁকতে গিয়ে ভবানীচরণের উপাদানগুলোকেই তিনি ব্যবহার করেছেন, কারণ সেই উপাদানগুলো সমকালীন সমাজে তখনও মোটামুটি একই ভাবে বজায় ছিল। পুরোহিত দাদাঠাকুরকে বাবুর ইয়ারবক্‌সিয়া জিগ্যেস করেছে বাইরে বেরিয়ে আসতে ইচ্ছুক কোনও কুলবধূর সন্ধান আছে কিনা :

—এখন বল দেখি চারে মাচ্ টাচ্ আছে কিনা?

—তা অনেক দেখতে পাওয়া যায় এক ২ জায়গায় তিন চারটে মাচ একসঙ্গে ঘাই দিচ্চে...

—থাকে কোথা এবং রকম কেমন এবং কি কোল্লে টোপ ধোরতে পারে?

—মহাশয়! রকম খুব ভাল, এদিকে আমাদেরই বটে, তাতে কোন দিকে অরুচি হবে না...আর টোপ ধরবার কথা যে বোললেন, আপুনি কি ভাজা মাচ উল্টে খেতে জানেন না? বিদ্যাসুন্দর বইখানি তো পোড়েচেন, স্মরণ করে দেখুন দেখি কিসে বাঘের দুদ মিলে?[৮৬] এরপর গৃহস্থ বাড়িতে গিয়ে টাকার বিনিময়ে মেয়েদের বের করে আনার উদ্যোগ নেয় দাদাঠাকুর। আরও আশ্চর্য, এই মেয়েরা নিজেরাই বেরিয়ে আসতে উৎসুক, তাদেরই একজন নিজেদের অবদমিত আকাঙক্ষা প্রকাশ করে ফেলেছে দাদাঠাকুরের সামনে :

> খুড়ীমা আমাদের স্বভাব দেখে সর্বদাই চোখে ২ রাখেন, রাত্রে পাশ ফিল্লে হাত দে দেখেন...দাদাঠাকুর! তোমার সাক্ষাতে বোলতে কি? আমরা চারিজনাতে আজ কতদিন পর্যন্ত পরামর্শ কোরেও কিছু কোরে উটতে পাচ্ছিনে।[৮৭]

দজ্জাল খুড়িমাকে টাকার লোভ দেখাতেই তিনি রাজি হলেন এবং তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়ির চারজন যুবতী মেয়েকেই বাবুর বাগানে পাঠাতে রাজি হলেন। 'বিবিদিগের খুড়িমাতা তিনি ইঙ্গিতমাত্রেই বুঝেচেন এবং অর্থলোভে সত্বরেই সম্মতা হলেন'।[৮৭] এখানে পারিবারিক কাঠামোয় পুরুষ-নিরপেক্ষ একধরনের সমান্তরাল কর্তৃত্বের ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায়। এরপর নির্দিষ্ট রাতে নববিবিরা বাবুর সঙ্গে বাগানবাড়িতে যাবার জন্য বেরিয়ে এল--'নববিবিদের খুড়ীমাতা যে সময়ে বাবুর হাত ধোরে সততা জানাচ্চেন, সেই সময়ে হবু বিবিরা কুলের মুখে ছাই দিয়া বাটীর বাহিরে এলেন।'[৮৮] কিন্তু বাগানবাড়িতে নববিবিদের উন্মত্ত ভোগোল্লাসের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ভোলানাথ জুড়ে দিয়েছেন সেইসব সতীসাধ্বী কুলবধূদের প্রতি তাঁর পক্ষপাত, যারা শত প্রলোভনেও কুলত্যাগে রাজি হবে না। এভাবেই সতী-সাধ্বী/অসতী, অলক্ষ্মী/গৃহলক্ষ্মী সংক্রান্ত বাইনারি বৈপরীত্যের যে ধারণা পরবর্তী সময়ের বাংলার সমাজে লেখালেখির বিষয়ে পরিণত হবে, তারই এক পূর্বাভাস দিয়েছেন তিনি, যা আমরা ভবানীচরণের লেখায় সেভাবে পাব না :

> ওখানে নববিবিরা তিন চার দিন উদ্যানে উত্তমরূপে আমোদ আহ্লাদ কোরচেন...এমন সুখ সৌভাগ্যের মুক্তপথ থাকতে যে সকল স্ত্রীলোকেরা কুলপিঞ্জরে বদ্ধ হইয়া সতীত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে, আহা! সেই সকল অবলাগণকে সকলের শত ২ ধন্যবাদ প্রদান করা কর্তব্য। ... পুরমধ্যে ভ্রষ্টা স্ত্রী থাকিলে কোনক্রমে সে পুরের মঙ্গলসাধন হয় না, পদে ২ বিপদ দর্শনই হইয়া থাকে।'[৮৯]

কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র অনুকরণে ভোলানাথও অল্পশিক্ষিত বাবুদের ক্লাব প্রতিষ্ঠা, ডিবেটিং সোসাইটি স্থাপন, সোস্যাল রিফর্ম প্রচেষ্টার হাস্যকর ও উদ্ভট লক্ষণগুলি নিয়ে দীর্ঘ মস্করা করেছেন। এবং এই বাবুকালচারও যে মুষ্টিমেয় ধনী পরিবারেই শুধু নয়, বরং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজের প্রায় সব স্তরেই ছড়িয়ে পড়েছিল তারও বর্ণনা দিয়েছেন তিনি:

> একজন অল্পায়ী মানবেরও পোঁদে একটি রাঁড় ও দৈনীক সুরাসেবনটী আছে; এদিকে পরিবারের পোঁদে বস্ত্র নাই, অন্নাভাবে পুরবাসিনীরা কেউ ঘুন্সী বিনুচ্চে, কেউ ছবিতে রং দিচ্চে, উপজীবিকার কারণ কত রকমই কষ্ট সহ্য কোচ্চে।'[৯০]

বিবিজানের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর সরকারমশাই নববাবুকে বুঝিয়েছেন 'খানকিদের আট্‌কাণ'-এর তাৎপর্য। ভবানীচরণ যেমন ছয় ছ-কারের দীর্ঘ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, ভোলানাথের লেখাতেও তেমনই পাই বেশ্যাদের আটপ্রকার ছলাকলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এই 'আটকাণ' হল :

> ঠাট ১ ঠমক ২ চটক ৩ চাল ৪
> মিথ্যা ৫ মান ৬ কান্না ৭ গাল ৮ [৯১]

কবিতায় এই 'অষ্টকলা'র ব্যাখ্যা দিয়েছেন ভোলানাথ। 'ঠাট' বলতে বোঝায় সহজ কথা সরলভাবে না বলে ন্যাকামি করে বলা। 'ঠমক' অর্থে বডি ল্যাংগুয়েজ অর্থাৎ হেলে দুলে, অঙ্গভঙ্গি করে চলাফেরা, 'চটক' বলতে বোঝায় 'অঙ্গ মার্জ্জনা', বিচিত্র খোঁপা বাঁধা, প্রসাধন কাপড় পড়ার হরেকরকম ভঙ্গি ইত্যাদি, 'চাল'-এর অর্থ প্রকৃত অবস্থা বুঝতে না দিয়ে বাবুকে সর্বদাই দেমাক দেখানো :

> পরিধেয় বাস যাহা রজকে দেখে না তাহা
> তথাপি কি উঁচু চাল, চলে বুক ফুলায়ে।।

'মিথ্যা' বলতে বোঝায় মনের ভাব গোপন করা, অন্যায় চাপা দেওয়া— 'অপকর্ম্ম করিয়াছে, হাতে হাতে ধরিয়াছে/ভাঁড়াবার পথ নাহি পায়।' 'মান' রসবতী নারীর পুরুষ বধের চিরকালীন অস্ত্র। অপর একটি অস্ত্র 'কান্না'—'দোষ কোরে কেঁদে জেতে গণিকা সকল।' পুরুষের চোখে আকর্ষণ বাড়াবার অপর একটি কৌশল 'গাল':

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্বদাই গালাগালি মুখে যেন বহে।
আগে গালাগালি দিয়ে পরে কথা কহে।।
প্রণয়েতে গালি দিয়ে প্রণয় বাড়ায়।
ভুয়ো হলে শেষে সেই গালেতে তাড়ায়।।[৯২]

এই বইয়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক ইয়ারবক্‌সিদের নিয়ে সমবয়স্ক বাবুদের রসালো আলোচনার আসরের জীবন্ত বর্ণনা। এক আকাঁড়া ভাষায় ভোলানাথ তুলে এনেছেন সেই বৈঠকখানার অনুপুঙ্ক্ষ ছবি, যেখানে যৌনতা, নতুন মেয়েমানুষ, মদ ইত্যাদি নিয়ে খোলাখুলি আলোচনার এক অনুমোদিত পরিসর খুঁজে পাওয়া যেত, সেই সমবেত হুল্লোড়ের জ্যান্ত চেহারাটা বার বার হাজির হয়েছে এই বইতে।

আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। এই বইতে বাগানবাড়িতে বেশ্যা সহযোগে বাবুদের সময় যাপনের বিশ্বাস্য ছবির পাশাপাশি, বাবু সহযোগে বেশ্যাদের কালীঘাটে মন্দির দর্শনের এক বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। সেখানে প্রকাশ্য দিবালোকে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত-কাঙালি-ভিখিরি-পুলিশ পরিবৃত হয়ে বেশ্যারা পুজো দিলেন—এই বর্ণনা কোথাও কি সেকালের জনসমাজে বাবু-বেশ্যা-মোসাহেব সংস্কৃতির আপেক্ষিক গ্রহণযোগ্যতাকেই স্বীকৃতি দেয় না? বাবুরা বেশ্যাদের নিয়ে রাস্তায় বেরোচ্ছেন, পথচারীরা খানিকটা কৌতুহল, খানিকটা মজা দেখার অছিলায় ভিড় জমাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সমবেত ঘৃণায় তারা তাদের দূরে সরিয়ে রাখছে—ব্যাপারটা বোধহয় ঠিক এরকম নয়। বাবুর বাগানের পার্টিতে নরক গুলজার চলছে, হাজার রকমের মানুষ সেখানে উপস্থিত। উদ্দাম ফুর্তির বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে :

বাতীর আলোতে পূর্ণিমার রাত্রের চেয়েও আলো হোয়েচে, প্রথম রাত্রে খেমটা নাচ হোচ্চে, বাবুরা সব আমোদে মেতে গেচেন, খেম্‌টাওয়ালিরা একের পা, দুয়ের পা, ছেপকা কাওয়ালী,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আড়খেমটা প্রভৃতি নেচে, বেদেনী, উড়্নী ও মগের নাচ পর্যন্ত্য নাচ্চে, চারদিক থেকে রুমাল পোড়চে। ... প্রাইভেট রুমেও মদ চলচে, দেখতে দেখতেই বাবুরা একরকম তয়ার হোলেন।... বাবুরা খেমটাওয়ালীদের সঙ্গে ন্যাক্‌রা কোত্তে ২ তাদের কামরাতে গেলেন।'[১৩]

লক্ষণীয়, এই ফূর্তির আসরে অনাহুত সামান্যজনেরাও উপস্থিত। শহরের নামকরা বেশ্যাদের সম্বন্ধে প্রাকৃতজনের নিষিদ্ধ কৌতূহলও টের পাওয়া যায় এই উক্তিতে :

আর ২ কত লোকে কত কথাই বোলচে, কেও বোলচে চন্ননবিলাসী কে? কেও বোলচে, ঐ যে চীনেপুত কাপড় পরা ঐ চন্ননবিলাসী। কেহ বোলচে ও না, ঐ হাতে যার রতনচুর ঐ চন্ননবিলাসী। কত গুলি লোকে এই রকম মিছে তর্ক কোচ্চে।[১৪]

এ থেকে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়, উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষা-নৈতিকতা-এটিকেট-চারিত্রগুণ প্রভৃতির সঙ্গে আমাদের দেশীয় রক্ষণশীলতার সমন্বয়ে শরীর ও যৌনতা সম্পর্কে যে নতুন মূল্যবোধের জন্ম হয়, সেই মূল্যবোধ কোনো একটিমাত্র সর্বাত্মক মান্যতার চেহারা নিতে পারেনি। সমাজে আরও অনেক দৃষ্টিকোণ, মূল্যবোধ, ভাল-মন্দ বিচারের পদ্ধতি টিকে ছিল অনেকদিন পর্যন্ত। এমনকি আজও তা রয়েছে। যদিও জীবনযাপনের নিভৃততম এইসব এলাকার ক্ষেত্রে আজকের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালি উনিশ শতকের শেষার্ধের সেই আলোকায়ন-লব্ধ যৌক্তিক মূল্যবোধের প্যানঅপটিক্যান ভেঙে বেরোতে পারেনি আজও। তাই উনিশ শতকের তথাকথিত শিষ্ট সাহিত্য কখনোই এই দোলাচল-মুক্ত, উল্লাসে ভরপুর জীবনযাপনকে স্বীকৃতি দেয়নি, তাকে এক বিকৃত, অবক্ষয়ী, কদর্য জীবনবোধ হিসেবেই চিহ্নিত করেছে। উনিশ শতকের এই নক্‌শাগুলো পড়তে গিয়েও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা ওই দৃষ্টিকোণ দ্বারাই প্রভাবিত হই বারবার। ফলে এইসব তথাকথিত 'সাবলিটারেচারে'র একপেশে মূল্যায়নের বাইরে বেরোনো সম্ভব হয় না বেশিরভাগ সময়েই।

১০

চঞ্চল। না মানে ওটা কী? Vulgar হওয়ার বাহাদুরিটা কোথায়?

হীরু। আপত্তিটাই বা কোথায়? অ্যাঁ? আপত্তি কিসের? ইচ্ছে হচ্ছে তাই হচ্ছি। এটা কে বে—সেন্সর সেনগুপ্ত নাকি?

চঞ্চল। না মানে এটা তো কোন culture হতে পারে না।

হীরু। সেটা কে ঠিক করে দেবে? তোমার মত আঁতেলরা? যারা শালা Film Festival-এ uncut ছবি দেখে বাথরুমে গিয়ে বলে আমি ফেলি নি? কী ছবি করে তোমাদের ওশিমা? Close-up-এ জাপানী মাসিমা?...

চঞ্চল। না দ্যাখো এভাবে personally নিলে, আমি তো এভাবে...

হীরু। কেন নয়? অ্যাঁ? আমার পত্নীর নাম রাধা আমার পুত্রের নাম কেলো আমার সঙ্গে বসে তুমি মদ গাঁজা গেলো আর তুমি ফেলিনি করলে শালা counter culture আর আমি করলে vulgarity? অ্যাঁ? মোনু মোনু, শোনো, তুমিও বান্টু খাড়া করে যৌবন কাটাচ্ছো, আমিও তাই, এসে পরস্পরের পায়ু প্রহার না করে সঙ্গীত মারাই —(গেয়ে ওঠে)—If you insert your penis into a juicy vagina.[১৫]

বাঙালির জীবনে শরীর-যৌনতা সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক কণ্ঠস্বর বনাম অবরুদ্ধ শরীরের দ্বৈতালাপের এটাই বোধহয় আজও সঠিক চেহারা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে মাইক্রোফ্যামিলি গড়ে ওঠার পরেও বাঙালি আজও হয়তো কোথাও বহন করে চলেছে কোনো এক দূর 'আধুনিক' কৌম রক্ষণশীলতার উত্তরাধিকার। আজও তার জীবনে নাগরিক ইনডিভিজুয়াল নেই। তার প্রাতিস্বিক সত্তা আজও নিজের শরীর এবং ডিজায়ারের মুখোমুখি সব পিছুটান ঝেড়ে ফেলে দাঁড়াতে শেখেনি। বাঙালির জীবনে আজ বিশ্বায়ন আছে, ইন্টারনেট পর্ণ, ব্লুসিডি আছে, ডানপন্থা-বামপন্থার দেশীয় সংস্করণ আছে, অথচ যৌনতা নেই। বস্তুত সাধারণ শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত দম্পতির মত 'অ-যৌন' দম্পতি বোধহয় অন্য কোনো একটিও জাতের মধ্যে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। গত দেড়শ বছরের বাংলা গল্প-উপন্যাস-কবিতা-সিনেমা ঘাঁটলে বোঝা যাবে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক ন্যারেটিভ দৈহিক কণ্ঠস্বরকে চাপা দিয়ে রাখতে কতোটা পছন্দ করে। তা না হলে স্বাধীনতা-উত্তর পর্যায়েও একটা 'রাত ভরে বৃষ্টি' বা 'বিবর' নিয়ে ওরকম আলোড়ন ওঠে? আর দৃশ্যমাধ্যমের কোনও পরিচালক সামান্যতম সাহসের পরিচয় দিতে গেলেই তাবৎ 'প্রগতিশীল' মধ্যবিত্ত বাঙালিকুল যেভাবে সমবেত প্রতিক্রিয়া জানান, তাতে বোঝা যায় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তনকে স্বাগত জানালেও শরীর-যৌনতাকে নিছক উপযোগিতাবাদী ক্রিয়ার স্তর থেকে খুব একটা আলাদাভাবে আজও দেখতে শেখেনি সে। কজন বাঙালি দম্পতি একে অপরের শরীরকে খুব নিবিড় ভাবে চেনেন? কজন বাবা-মা আজও তাঁদের সন্তানের প্রাক্-বিবাহ যৌনতাকে স্বীকৃতি দেন? কজন নারী-পুরুষই বা বিবাহ-বহির্ভূত যৌনতাকে আজও খোলা মনে গ্রহণ করতে পারেন? কজন নারী আয়নার সামনে নিজেকে নগ্ন দেখার সাহস রাখেন? রাখেন না, কারণ বাঙালির মত যৌন উপোসী, যৌন হীনম্মন্যতায় ভোগা জাতি আর দুটি নেই।

১৯২৬ সালের বড়দিনে শ্রীভবানী লাহা কর্তৃক অঙ্কিত ও সংকলিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে একটি অ্যালবাম প্রকাশিত হয়। সংকলনটির নাম —'শোভা'। বইটিতে তৎকালীন সোনাগাছির বিখ্যাত বেশ্যাদের পূর্ণাবয়ব ছবি ছাপা হয়েছিল। তার দুয়েকটি ফোটোগ্রাফ, বেশিরভাগই হাতে আঁকা পোর্ট্রেট। প্রত্যেকটি ছবির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উদ্ধৃত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতার পঙ্‌ক্তি। পঙ্‌ক্তিগুলি নির্বাচন করে দিয়েছিলেন শ্রীনরেন্দ্র দেব। ভূমিকা লিখেছিলেন ভবানীচরণ লাহা।[৯৬] শোনা যায় বইটি বেরোনোর পর রবীন্দ্রনাথ খুবই চটে যান। তাই এটুকুই বোধহয় সব নয়। প্রাতিষ্ঠানিক বাচন সমাজের উপরিতলের যে চলচ্ছবি আঁকার চেষ্টা করে, তার সবকটি শাখাকে যে কথা বলানোর জন্য কাজে লাগায়, ঠিক তার উল্টো বাচনের জন্ম হয় সমাজের ভিতরেই। তাকে হয়তো সবসময় চোখে দেখা যায় না, তাকে হয়তো অবদমিত রাখা হয়, অথচ কান পাতলে টের পাওয়া যায় তার চাপা কণ্ঠস্বর। বোঝা যায় ভিতরে ভিতরে একটা পরিবর্তনের হাওয়া বইছে। নাগরিক সমাজের যুবকযুবতীর মধ্যে প্রাক্‌-বিবাহ যৌনতা, অবাধ মেলামেশা ক্রমশ বাড়ছে। একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় জানা যাচ্ছে, ভারতের প্রধান মেট্রোপলিসগুলিতে ৭০ শতাংশের বেশি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী আজ 'ভার্জিন' নয়, মধ্যবিত্ত রক্ষণশীলতা কাটিয়ে বাঙালি তার ঘরের দরজা বন্ধ করতে শিখছে, বাড়ছে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক—সব মিলিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন চেহারায় বাঙালি সমাজে কথা বলতে চাইছে অবরুদ্ধ শরীর। কাজেই শরীরকে দিয়ে কথা বলানোর জন্য আমাদের কোনও পাশ্চাত্য ফুকোর প্রয়োজন নেই, 'মাংসের স্বীকারোক্তি'[৯৭] প্রকাশের পদ্ধতি আমাদের সমাজে আগেও ছিল, আজও আছে, কেবল তার রূপ বদল ঘটেছে মাত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উল্লেখপঞ্জি

১. কেউ ভালবেসে জয়; 'আর জানি না'; চন্দ্রবিন্দু, টি সিরিজ ক্যাসেট কোম্পানি; ১৯৯৭

২. *Discipline and Punish : The birth of the prison;* Michel Foucault; translated by Alan Sheridan; New York, 1979; p-201

৩. *Introduction to the Devout Life* (১৬০৯) বইয়ে, সন্ত ফ্রান্সিস বলেছিলেন, হাতি অত্যন্ত সৎ, সে তার সঙ্গিনী কখনোই বদলায় না। তাছাড়া, তিনবছরে মাত্র পাঁচদিনের জন্য সঙ্গিনীর সঙ্গে সহবাস করে পুং হাতি। ষষ্ঠ দিনে নদীর জলে নিজেকে বিশুদ্ধ করে নিয়ে আবার সে ভিনদেশে পাড়ি দেয়। ফ্রান্সিসের মতে, এটা মানব দম্পতির ক্ষেত্রেও আদর্শ স্থানীয় হওয়াই কাম্য।

৪. *সাহিত্য সাধক চরিতমালা, খন্ড* ১; সম্পাদনা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ-১৩

৫. *The Intimate Enemy : Loss and Recovery of Self Under Colonislism;* Ashih Nandy; Oxford; 1983, p-xi

৬. *Rabelias and his world;* M.M. Bakhtin; Bakhtin Reader; edited by Pam Moris, Great Britain, 1994

৭. Ashis Nandy; ibid, p-16

৮. *A Descriptive Catalogue of Bengali Works by J. Long;* বইটি আগাগোড়া পুনর্মুদ্রিত হয়েছে দীনেশচন্দ্র সেন-এর *'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'*-এর ২য় খন্ডে, পৃ-৮২৮

৯. *সংবাদপত্রে সেকালের কথা,* ২য়(খন্ড); ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃ-৭৪৪

১০. পূর্বোক্ত; পৃ-২৭১

১১. 'বেশ' : *রহস্য সন্দর্ভ,* ১ খন্ড ১৯১৯ সংবৎ (১৮৬২)

১২. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী, ১৯৮৩; পৃ-২০২

১৩. *সধবার একাদশী; দীনবন্ধু রচনাবলী,* কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ-১৫১

১৪. সুলভ সমাচার; ১৫ই এপ্রিল ১৮৭৩

১৫. সুলভ সমাচার; ২৬ অক্টোবর ১৮৭৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৬. ভারত সংস্কার; ২২ আগস্ট ১৮৭৩

১৭. আমাদের আধুনিকতা; *ইতিহাসের উত্তরাধিকার;* পার্থ চট্টোপাধ্যায়, পৃ-১৮১, কলকাতা, ২০০০

১৮. সূত্র : *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য,* ২য় খন্ড, দীনেশচন্দ্র সেন; পৃ-৮২৮

১৯. উদ্ধৃত, যৌনতা ও সংস্কৃতি; প্রদীপ বসু; *যৌনতা ও সংস্কৃতি;* সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, পৃ-২৫; কলকাতা, ২০০২

২০. জাতীয় দৈহিক পুনরুজ্জীবন; চিকিৎসা সম্মিলনী, বৈশাখ, ১২৯২ বঙ্গাব্দ, উদ্ধৃত, *সাময়িকী (প্রথম খণ্ড),* সম্পা. প্রদীপ বসু, আনন্দ পাবলিশার্স

২১. দেশীয় স্বাস্থ্য বিজ্ঞান: অভিগমন বা স্ত্রী-পুরুষ সংসর্গ; অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন; চিকিৎসা সম্মিলনী, বৈশাখ, ১২৯২ বঙ্গাব্দ (১৮৮৫), উদ্ধৃত, *সাময়িকী (প্রথম খণ্ড),* সম্পা. প্রদীপ বসু, আনন্দ পাবলিশার্স

২২. পূর্বোক্ত প্রবন্ধ

২৩. পূর্বোক্ত প্রবন্ধ

২৪. পূর্বোক্ত প্রবন্ধ

২৫. জাতীয় দৈহিক পুনরুজ্জীবন, উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত

২৬. হস্ত মৈথুনে বালক ও নবযুবকগণ, প্যারীমোহন সেনগুপ্ত; চিকিৎসা সম্মিলনী, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ (১৮৯২), উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত

২৭. ভারতের অবনতি, অণুবীক্ষণ, পৌষ ১২৮২ বঙ্গাব্দ (১৮৭৫) উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত

২৮. পূর্বোক্ত প্রবন্ধ

২৯. দেশীয় স্বাস্থ্য বিজ্ঞান : অভিগমন বা স্ত্রী-পুরুষ সংসর্গ, উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত।

৩০. Hindu Wife, Hindu Nation : Domesticity and Nationalism in Nineteenth Century Bengal; Tanika Sarkar; *Hindu Wife, Hindu Nation,* p-38, Delhi, paperback Edition, 2003

৩১. Sons of the Nation : Child rearing in the New Family; Pradip Kumar Bose in *Texts of Power: Emerging Disiplines in Colonial Bengal*; p-134, Calcutta, 1996

৩২. অশ্লীলতা, বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮০ (১৮৭৩), *বঙ্গদর্শন সমগ্র,* খন্ড ২, পৃ. ৩৪৬, কলকাতা ১৯৮৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৩. পূর্বোক্ত; পৃ-৩৪৬

৩৪. পূর্বোক্ত; পৃ-৩৪৭

৩৫. পূর্বোক্ত; পৃ-৩৪৭

৩৬. কবিসংগীত; সাধনা, জ্যৈষ্ঠ ১৩০২, রবীন্দ্ররচনাবলী (সুলভ) খন্ড ৩; পৃ-৭৯১-৭৯২

৩৭. সভাসদ শ্রীযুক্ত গোপাল ভাঁড়; গৌতম ভদ্র; রবিবাসরীয় আনন্দবাজার, ২৪ নভেম্বর, ২০০২

৩৮. *পুরাতন প্রসঙ্গ*; বিপিনবিহারী গুপ্ত; পৃ-২৩৪; কলকাতা, ১৯৮৯

৩৯. পূর্বোক্ত; পৃ-২৩৭

৪০. *বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে*; বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ-১৭১; কলকাতা, ১৯৯৬

৪১. পূর্বোক্ত; পৃ-১৭২

৪২. পূর্বোক্ত; পৃ-১৭২

৪৩. পূর্বোক্ত; পৃ-১৭৩

৪৪. The Hindu Patriot, ১৫ এপ্রিল ১৮৭২

৪৫. উদ্ধৃত, *বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে*, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ-২৭

৪৬. উদ্ধৃত; *অশ্রুত কণ্ঠস্বর*, সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ-১২৬, কলকাতা, ২০০২

৪৭. বদমাএস জব্দ, প্রাণকৃষ্ণ দত্ত; *দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ*, খন্ড ১, পৃ-৫, কলকাতা, ১৯৯৭

৪৮. পূর্বোক্ত; পৃ-৬

৪৯. পূর্বোক্ত; পৃ-১১

৫০. *সপত্নী নাটক*; তারকচন্দ্র চূড়ামণি; পৃ-১৩; কলকাতা, ১৮৫৮, উদ্ধৃত, *দুষ্প্রাপ্য বাংলা সাহিত্য*, (প্রথম খণ্ড), সম্পা. অর্ণব সাহা, ২০১০

৫১. *পূর্বোক্ত*; পৃ-১৩২

৫২. *মাগ-সর্বস্ব*; হরিমোহন কর্ম্মকার, পৃ-২; কলকাতা, ১৮৭০

৫৩. উদ্ধৃত; *অন্দরে অন্তরে; উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা*; সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, পৃ-১৫১, কলকাতা, ১৯৯৮

৫৪. *কুলীনকুলসর্বস্ব*; রামনারায়ণ তর্করত্ন; পৃ-৫২, কলকাতা ১৮৫৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫৫. *ভ্যালারে মোর বাপ;* ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়; পৃ-৪১, কলকাতা, ১২৮৩ (১৮৭৬), উদ্ধৃত, দুষ্পাপ্য বাংলা সাহিত্য, সম্পা. অর্ণব সাহা, ২০১০

৫৬. The difference-differal of Colonial Modexity : Public Debates on domesticity in English Bengal; Dipesh Chakrabarty in *Subaltern Studies VIII,* New Delhi; 2003, p-58

৫৭. *বাঙালি জীবনে রমণী;* শ্রী নীরদচন্দ্র চৌধুরী; পৃ-৭৭, কলকাতা, ১৯৬৮

৫৮. উদ্ধৃত; পূর্বোক্ত; পৃ-৭২

৫৯. পূর্বোক্ত; পৃ-৭৩

৬০. বিবাহিত জীবন; বিনোদিনী সেনগুপ্তা; 'বামাবোধিনী' পত্রিকা, মাঘ-ফাল্গুন, ১৩০৭

৬১. পতিব্রতা ও পাতিব্রত্য; পরিচারিকা; শ্রাবণ, ১২৮৬; উদ্ধৃত, *'অন্দরে অন্তরে'* পৃ-১১৩

৬২. অঘোরপ্রকাশ; প্রকাশচন্দ্র রায়; ১৩৬৪; উদ্ধৃত, *'অন্দরে অন্তরে'*, পৃ-১৩৬

৬৩. স্বামী বশীকরণ মন্ত্র, 'সাধারণী' ১৪ ভাদ্র, ১২৮৭; উদ্ধৃত, *'অন্দরে অন্তরে'*, পৃ-১১৫

৬৪. নববাবুবিলাস; ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; *ভবানীচরণ রসরচনাসমগ্র;* পৃ-৪৩, কলকাতা, ১৯৮৭

৬৫. পূর্বোক্ত; পৃ-৪৩

৬৬. পূর্বোক্ত; পৃ-৪৪-৪৫

৬৭. পূর্বোক্ত; পৃ-৫১

৬৮. পূর্বোক্ত; পৃ-৫১

৬৯. পূর্বোক্ত; পৃ-৫৫

৭০. নববিবিবিলাস; *ভবানীচরণ রসরচনাসমগ্র;* পৃ-১৭২

৭১. পূর্বোক্ত; পৃ-১৭৩

৭২. পূর্বোক্ত; পৃ-১৭৪

৭৩. পূর্বোক্ত; পৃ-১৭৫

৭৪. পূর্বোক্ত; পৃ-১৭৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭৫. পূর্বোক্ত; পৃ-১৮১

৭৬. পূর্বোক্ত; পৃ-১৮৩

৭৭. পূর্বোক্ত; পৃ-১৯৫

৭৮. The discreet charm of the Bhadraloks : An excersion into Pornotopia; Shibaji Bandyopadhyay; JJCL 29; 1990-91; p-78

৭৯. *নববিবিবিলাস;* পূর্বোক্ত; পৃ-২০১

৮০. পূর্বোক্ত; পৃ-২০২

৮১. পূর্বোক্ত; পৃ-২০২

৮২. পূর্বোক্ত; পৃ-২০২

৮৩. পূর্বোক্ত; পৃ-২০২

৮৪.আপনার মুখ আপুনি দেখ; ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়; *দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ,* খন্ড ২; পৃ-১৮, কলকাতা, ১৯৯৭

৮৫. পূর্বোক্ত; পৃ-১২৩

৮৬. পূর্বোক্ত; পৃ-২১-২২

৮৭. পূর্বোক্ত; পৃ-২৫

৮৮. পূর্বোক্ত; পৃ-২৬

৮৯. পূর্বোক্ত; পৃ-২৭

৯০. পূর্বোক্ত; পৃ-৪৭

৯১. পূর্বোক্ত; পৃ-৫৯

৯২. পূর্বোক্ত; পৃ-৫৯-৬০

৯৩. পূর্বোক্ত; পৃ-১২১

৯৪. পূর্বোক্ত; পৃ-১১৭

৯৫. Y2k অথবা 'সেক্স ক্রমে আসিতেছে'; সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য; রচনা ও পরিচালনা; চন্দ্রিল ভট্টাচার্য; *অপর ১০,* জানুয়ারি ২০০২; পৃ-১৫৩

৯৬. বইটি প্রকাশিত হয় ২২৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলকাতা থেকে, এটি আমায় দেখিয়েছেন *'বিভাব'* পত্রিকার সম্পাদক শ্রীরাহুল সেন।

৯৭. ফুকোর *History of Sexuality*-র পরিকল্পিত অথচ অসমাপ্ত চতুর্থ খন্ডের শিরোনাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~